CADENCE

Annual Magazine 2024

BANGLADESH UNIVERSITY OF PROFESSIONALS

Cadence

বিইউপি বার্ষিক ম্যাগাজিন-২০২৪

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি)
মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা।

সার্বিক তত্ত্বাবধান ও পৃষ্ঠপোষকতা : **মেজর জেনারেল মোঃ মাহ্বুব-উল আলম**, বিএসপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, এমফিল, পিএইচডি

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ২০২৪

বার্ষিক প্রকাশনা : ৭ম

কভার ডিজাইন : জান্নাতুল ফেরদৌস ইতি
ডিপার্টমেন্ট অব সোশিওলজি, সেশন: ২০২০-২০২১

প্রকাশক : বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি)

সহায়তাকারী : অ্যাসিস্টেন্ট অ্যাডমিন অফিসার মোঃ রাজীব হোসেন
কম্পিউটার অপারেটর মোঃ মঈনুল ইসলাম চৌধুরী
কম্পিউটার অপারেটর মোঃ ফারুক হোসেন
গ্রাফিক্স ডিজাইনার মাহ্মুদুর রহমান (ডিজাইন অ্যান্ড ক্যালিব্রেশন)।

প্রকাশনায়
অফিস অব দ্য পাবলিক রিলেশন্স, ইনফরমেশন অ্যান্ড পাবলিকেশন্স
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি)
মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা-১২১৬
ফোন: +৮৮-০৯৬৬৬-৭৯০৭৯৯, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-২২৩৩৭৩১৯৭
ই-মেইল: info@bup.edu.bd, ওয়েবসাইট: www.bup.edu.bd

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
মেজর জেনারেল মোঃ মাহ্‌বুব-উল আলম, বিএসপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, এমফিল, পিএইচডি

উপদেষ্টা
অধ্যাপক খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন, পিএইচডি

প্রধান সমন্বয়কারী
এয়ার কমডোর ফেরদৌস মান্নান, বিপিপি, পিএসসি, এডিডব্লিউসি

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক

গ্রুপ ক্যাপ্টেন মোঃ শফিউল ইসলাম, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, এডিডব্লিউসি

লে: কর্নেল সিরাজ উদ্দিন আহমেদ, পিএসসি (অবঃ)

সহযোগী অধ্যাপক ড. ফাহমিদা হক

মোহাম্মদ শওকত ওসমান

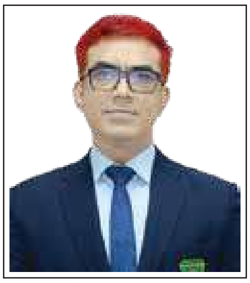

মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর

মেজর মমতাজ আলা শিব্বির আহম্মেদ (অবঃ)

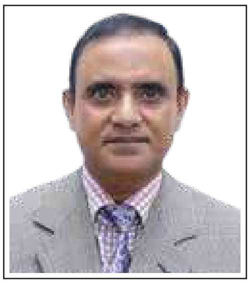

মেজর মোঃ সাবির আহমেদ, পিএসসি (অবঃ)

ড. মোঃ সাইফুল ইসলাম

প্রলয় মুখার্জী

মোঃ ওসমান গণি

বাণী

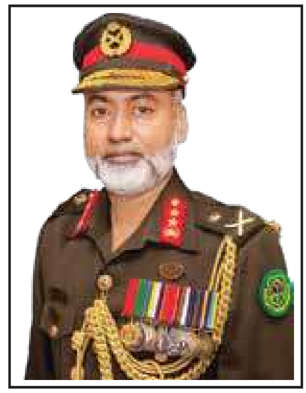

উপাচার্য
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস
মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা।

সৌহার্দপূর্ণ ও সম্প্রীতিময় সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা ও জ্ঞানভিত্তিক দক্ষতার পাশাপাশি তাদের মানবিক মূল্যবোধ ও সুকুমারবৃত্তির চর্চা আবশ্যক। সুকুমারবৃত্তি চর্চার জন্য পারিবারিক ও সামাজিক শিক্ষার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। একজন শিক্ষার্থীর মানবিকতা, মনুষ্যত্ব, সহনশীলতা, শ্রদ্ধাবোধ, সহমর্মিতা–সর্বোপরি মানসিক উৎকর্ষ সাধনে সুকুমারবৃত্তির বিকাশ প্রয়োজন। শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা শিক্ষার্থীদের অন্তর্নিহিত উদ্ভাবনীশক্তি ও দক্ষতাকে জাগিয়ে তোলে, যা তাদের বুদ্ধিমত্তা, মেধা এবং সামর্থ্যকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যায় এবং মানবীয় গুণাবলীসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে।

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস-এর বার্ষিক ম্যাগাজিন 'Cadence'-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের অন্তর্নিহিত চেতনার স্ফূরণ ঘটায় যা আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, মানবিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমকে শানিত করে। আমি বিশ্বাস করি, শিক্ষার্থীদের এই সৃষ্টিশীল প্রয়াস আমাদের ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে, যা সমাজ বিনির্মাণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

বার্ষিক ম্যাগাজিন 'Cadence' আমাদের সকলের ঐকান্তিক ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার দর্পণস্বরূপ। বিইউপি বার্ষিক ম্যাগাজিনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

মেজর জেনারেল মোঃ মাহ্‌বুব-উল আলম, বিএসপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, এমফিল, পিএইচডি

বাণী

উপ-উপাচার্য
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস
মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা।

'Cadence'-এর সপ্তম প্রকাশনার সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন!

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি) এর শিক্ষার্থীরা জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন উদ্ভাবনী দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে দেশ ও সমাজের উন্নয়ন ও পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে সদা সচেষ্ট। এরই ধারাবাহিকতায় ইংরেজি নববর্ষ ২০২৫-এ বিইউপি হতে প্রকাশিত 'Cadence' ম্যাগাজিন সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বাড়াতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস। বিইউপির শিক্ষক, কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধির মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এই ম্যাগাজিনটির ধারাবাহিকভাবে অবদান রাখার উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই। এ ম্যাগাজিনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মকর্তারা ছোট গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, ভ্রমণকাহিনী ও নানাবিধ লেখনির মাধ্যমে যে অবদান রেখে চলেছেন তা বিইউপির সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে নানাভাবে আকর্ষণীয় ও সমৃদ্ধ করে তুলছে।

মানসিক উৎকর্ষ ও সৃজনশীলতা বৃদ্ধির জন্য এ ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বর্তমান সমাজের তরুণ সম্প্রদায়ের জন্য খুবই সময়োপযোগী, বিশেষ করে বর্তমান বিশ্ব পরিমণ্ডলে যেখানে নানাধরনের অপসংস্কৃতি চর্চা বিদ্যমান সেখানে 'Cadence'-এর মাধ্যমে নিজস্ব সংস্কৃতির লালন ও সংরক্ষণের গুরুদায়িত্ব এই তরুণ প্রজন্মের মাধ্যমে ধরে রাখার অব্যাহত প্রচেষ্টা অবশ্যই অতিমাত্রায় প্রশংসার দাবিদার। আর এ লক্ষ্যে ম্যাগাজিনটি বিইউপির শিক্ষার্থীদের সকল ধরনের সৃজনশীল লেখনীর মুখপাত্র হিসেবে একান্ত নিষ্ঠার সাথে কাজ করছে বলে আমি মনে করি। মননশীল ও সৃজনশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে এ ম্যাগাজিনের অবদান সবার জন্য অনন্য ও ব্যতিক্রমধর্মী। জ্ঞানের নিত্য-নতুন আলোকে উদ্ভাসিত হওয়ার লক্ষ্যে এ ম্যাগাজিনের মাধ্যমে বিইউপি পরিবার ভবিষ্যতে দেশীয় সংস্কৃতির বিকাশে অধিকমাত্রায় সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ডে সক্রিয় হবে–এ প্রত্যাশা আমাদের সকলের।

এ প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলের প্রতি রইলো আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভ কামনা! আমি এ ম্যাগাজিনের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সফলতা কামনা করছি।

অধ্যাপক খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন, পিএইচডি

প্রধান সমন্বয়কারীর বাণী

প্রধান সমন্বয়কারী
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস
মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা।

'Cadence'-এর সপ্তম প্রকাশনায় সকলকে আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। একাডেমিক পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি নিয়মিত সাহিত্যচর্চা শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। বিইউপির শিক্ষক, কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীদের মেধা, মনন ও চেতনার বিকাশ এবং সুকুমারবৃত্তি চর্চার মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে বিইউপি বার্ষিক ম্যাগাজিন 'Cadence'।

আমি জেনে খুশি হয়েছি যে, এ প্রকাশনাটি বিইউপির শিক্ষক, কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থী কর্তৃক রচিত সমসাময়িক বিষয়ভিত্তিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও স্মৃতিচারণমূলক বিভিন্ন প্রবন্ধ, ছোটগল্প, কবিতা, ভ্রমণকাহিনী ও শিক্ষামূলক রচনাসমূহের সংকলনে সমৃদ্ধ হয়েছে। এই সৃষ্টিশীল লেখাগুলো আমাদের মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটিয়ে আধুনিক চিন্তাশীল, সৃজনশীল ও দেশপ্রেমিক নাগরিক গঠনে ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশাবাদী।

পরিশেষে, বিইউপি বার্ষিক ম্যাগাজিন প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রাণঢালা অভিনন্দন।

এয়ার কমডোর ফেরদৌস মান্নান, বিপিপি, পিএসসি, এডিডব্লিউসি

সম্পাদকীয়

প্রধান সম্পাদক
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস
মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা।

মানুষের সৃজনশীলতা ও মুক্তচিন্তা বিকাশের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে নিয়মিত সাহিত্যচর্চা। সাহিত্য মানুষের প্রবাহমান জীবনের কথাকেই বাঙ্ময় করে তোলে। যে সাহিত্য যত সহজভাবে জীবনকে প্রাসঙ্গিক করে তুলে ধরে সে সাহিত্যকর্ম তত হৃদয়স্পর্শী এবং কালজয়ী। সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে জীবনের গল্পগুলোকে সর্বজনীনভাবে প্রকাশের দক্ষতা একজন শিক্ষার্থীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আগামীর সমাজ বিনির্মাণে শিক্ষার্থীদের মাঝে মানবিক মূল্যবোধ, পারস্পরিক সৌহার্দ, সামাজিকতাসহ ন্যায়-অন্যায়বোধ জাগ্রতকল্পে পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম ও সৃজনশীল লেখনীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিইউপির বার্ষিক ম্যাগাজিন 'Cadence'-এরই বহিঃপ্রকাশ।

'Cadence' ম্যাগাজিন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত প্রকাশনার মধ্যে অন্যতম। যে কোনো প্রকাশনা মানুষের মেধা, মননশীলতা, সৃজনশীলতা ও সাহিত্যচর্চার দলিলস্বরূপ। বিইউপির শিক্ষক-কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীর লেখনী দ্বারা আবারও 'Cadence' ম্যাগাজিন-২০২৪ প্রকাশ হতে যাচ্ছে। এতে স্থান পেয়েছে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, গবেষণা ও শিক্ষামূলক এবং সমসাময়িক বিষয়াবলি। আমি আশা করি বিইউপির এ ম্যাগাজিন পাঠক হৃদয়কে অনাবিল আনন্দ দেবে।

পরিশেষে 'Cadence' প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক-কর্মকর্তা, শিক্ষার্থী এবং সম্পাদনা পরিষদের সকলের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

গ্রুপ ক্যাপ্টেন মোঃ শফিউল ইসলাম, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, এডিডব্লিউসি

সূচীপত্র
বিইউপি ম্যাগাজিন-২০২৪

ক্র/নং	শিরোনাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা নং
০১	University Freshers to Ponder on Pursuing Objectives	Major General Md Mahbub-ul Alam, BSP, ndc, afwc, psc, MPhil, PhD	০১
০২	Global Atmospheric Circulation	Lt Col Mohammad Mahmudur Rahman Niaz	০৪
০৩	Electronic Public Relations Practice in this Era	Md. Jahangir Kabir	০৮
০৪	Lack of Interest in Data Provision Harms Bangladesh's National Development	Tahmina Sultana	১০
০৫	Potatoes, Passion and Pride	Rifa Tasnia	১২
০৬	Safe Havens Reclaimed: The Family's Role Beyond Old Age Homes	Jannatul Bakia Jeni	১৪
০৭	Navigating the Moral Maze: Ethical Dilemmas in Modern Marketing	Ashik Abdullah	১৬
০৮	Transforming Universities: The Significance of Outcome-Based Education (OBE) in the Era of Fourth Industrial Revolution	Mafi Rahman	১৯
০৯	From Ballot to Decree: The Coercion of Power is Inevitable	Md. Tanvir Mahtab	২২
১০	The Wall	Tasnim Naz Chowa	২৪
১১	Is Your Mind Persuaded by Rumours? It is our responsibility to be careful regarding Rumours	Muhammad Kawsar Mahmud	২৬
১২	Europe Guide 2023: A Journey of Conviction and Sufferance	Mst. Dilshad Sharmin Chowdhury	২৯
১৩	United Hearts for Love & Struggle	Helal Uddin	৩১
১৪	The Unbreakable Hand	Mohammad Fahim Faysal	৩৪
১৫	Fueling Innovation: Why Universities Like BUP Should Encourage Student Involvement	Fyruz Yazdani Shukria	৩৫
১৬	A Rather Odd Fear	Tasneem Azim	৩৭
১৭	The Art of Saving: A Path to Financial Freedom	Atiya Sultana Asha	৩৯
১৮	I Hate Rainy Days	Saleh Muhammad Musa	৪১
১৯	Love's Paradox: Finding Peace in a World of Suffering	Mst. Fatema Binta Alam Jim	৪৩
২০	Dystopian Dream	Nashita Shahid	৪৫
২১	The Sweet Strawberry Boy	Azra Mahjabin Nirjhor	৪৭
২২	Yellow Cabinets	Lum Yea Hossain Ankona	৪৮
২৩	Beneath the Same Sky	Shurovi Akter	৫০
২৪	The Delusion	Md. Shah Abdul Aziz	৫১
২৫	The Echoes in “Me”	Sumiya Afrin	৫২
২৬	Ode to My Motherland, Bangladesh	Nahidul Islam Nayon	৫৩
২৭	Bloodshed of July	Nahin Rahman Sami	৫৪

সূচীপত্র

বিইউপি ম্যাগাজিন-২০২৪

ক্র/নং	শিরোনাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা নং মন্তব্য
০১	শিক্ষার্থীদের পেশাগত বিকাশে নেটওয়ার্কিংয়ের গুরুত্ব	মেজর সাবির আহমেদ (অব:)	৫৫
০২	গবেষণা, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ	ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	৫৭
০৩	রক্তের ভাষা	তোফায়েল আহমেদ	৫৯
০৪	উন্মুক্ত ইন্টারনেটে মুক্তপেশা-চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা	প্রলয় মুখার্জী	৬১
০৫	স্বাধীনতা ও শান্তি	জাহরা আনজুম	৬৩
০৬	বিভিন্ন সংস্কৃতিতে বৈশাখ	রুবাইয়াত সানজিনা রানিলা	৬৫
০৭	আক্ষেপ	মো: কাইয়ুম আলী	৬৮
০৮	মাতৃত্ব বনাম অধ্যয়ন: এক অনন্য অভিজ্ঞতা	জান্নাতুল ফেরদৌস ইতি	৭০
০৯	মেঘে ঢাকা ভোর	এস এম নাজিব উল আলম	৭৩
১০	নিয়তি	মোস্তফা জামান কায়সার	৭৫
১১	একজন অনেকজন	জান্নাতুল ফেরদৌস	৭৭
১২	তাপদাহ এবং বৃক্ষরোপণ	ইমতিয়াজ আহমেদ	৮০
১৩	জীবনের শিক্ষা	এস এম নাহিদ সারোয়ার সুমন	৮১
১৪	ইন্টারনেট ও স্বশিক্ষা	রুমাইসা আহম্মেদ নাবা	৮৩
১৫	Gen- Z (জেন-জি)	মোঃ জুনায়দুল ইসলাম	৮৪
১৬	একান্ত অনুরোধে	আল জামাল মোস্তফা সিন্দাইনী	৮৬
১৭	কথা	মেজর মোঃ মাহবুব আলম	৮৭
১৮	বৃষ্টি সুন্দর!	মোঃ তারিফুজ্জামান	৮৮
১৯	শ্রেষ্ঠ তারা	হোজাইফা রহমান খান	৯০
২০	শিক্ষা	মোঃ মশিউর রহমান অন্তর	৯২
২১	জলপোকা	মোঃ ফুয়াদ হাসান	৯৩
২২	মানবজাতির জাগরণ	সামিয়া জাহান	৯৪
২৩	স্মৃতির পাতা	তামজিদ আহমেদ ইমন	৯৬
২৪	মহীয়সী নারী	তামান্না তাসনিম	৯৭

University Freshers to Ponder on Pursuing Objectives

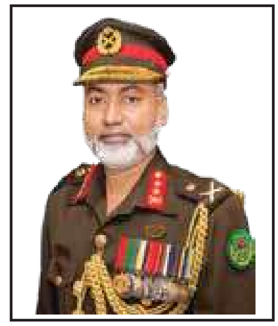

Major General Md Mahbub-ul Alam
Vice Chancellor, BUP

University is a new and mysterious arena for the newly inducted students. Many of them falter on entry due to a lack of adequate briefing on how to grasp the best possible benefit to achieve the desired goals. Everyone needs to understand that education is not only bounded to developing skills in specific subjects, but its fulfilment also depends on implementing the earned skills for mankind embedded with morals and ethics. Therefore, education should be designed to help an individual to think clearly and act accordingly. Besides, developing subject matter expertise, a student at the tertiary level must ponder on inculcating qualities such as discipline, tolerance, empathy, honesty and integrity, self- confidence, learning ability, moral values, etc. This article aims to pen down some suggestive guidelines for the freshers of Bangladesh University of Professionals (BUP), which may also apply to other students.BUP offers a kind of education that enables one to understand the realities better. In line with the commitment of BUP to providing education, it underscores the importance of outcome-based and need-based education. Outcome-based education focuses on achieving specific goals and ensuring students acquire the necessary skills and knowledge to excel in their respective selected fields. Similarly, we recognise the importance of addressing our society's specific needs and aspirations, strengthening the societal fabric, ethical standards, and moral values. One of the strategies of BUP is to create an environment where students' strengths are developed, and they are empowered to pursue their dreams.

Certain values are highly esteemed and unbendable in BUP, and discipline is the utmost among those. In fact, it is one of those values that earned BUP its reputation in a very short period. Students are urged to be disciplined, and BUP ensures the appropriate environment to inculcate this quality. Moral and ethical values are two other top-priority elements for the students to acquire and display as they step into the new chapter of their lives. In this interconnected world, it is indispensable to remember that university students' actions hold great power. Upholding principles of integrity, honesty, and respect for others will shape their character as well as give them the ability to influence the community they become a part of. Adoption of these values will guide them towards personal and professional success, and in the end, they will develop themselves as a good human being, which is the prime requirement.

Time management is another key aspect of university life. Pursuing knowledge of the rigours of academia can be demanding, but with effective time management, students can balance academic responsibility, extracurricular activities, and personal life. They need to learn how to prioritise objectives, set goals, and allocate time wisely, where periodical guidelines are provided by BUP. Time is a precious resource; meticulous time utilisation determines one's accomplishments. To remain organised, students are expected to know time management techniques, and must not falter to utilise their time appropriately. They must be able to learn how to allocate specific time for a specific job.

Education is not limited to teaching people to know what they do not know; the meaning encompasses teaching them to behave where they are likely to falter. At university, a fresher should ponder on how to mould their behaviour to become a useful and contributing member of society. An individual's learning outcome is felt by his/her conduct, especially in society as everyone continuously learns from the family and society as well. Therefore, it is to be remembered that all social learning may not be appropriate and ethical. As a university student, one should have the zeal to unlearn evil social practices, if there are any. At the same time, righteous social learning is essential for students as it not only contributes to academic development but also plays a crucial role in shaping their social, emotional, and interpersonal skills, which are vital for success in both academic and professional settings.

Every individual possesses a unique philosophy. Ideology must be shaped by an individual's ethics, morals, and patriotism, and then onwards he/she must uphold it at any cost. Adequate effort must be put into developing oneself as a patriot. Patriotism is important for students because it cultivates a sense of national pride and inspires them to contribute to the country's prosperity. These are especially crucial for students, as they are the vital forces of the nation and the hope for the future. Patriotism acts as a moral compass and motivates students to strive for excellence in their studies and future careers. It also plays a significant role in maintaining state security and building a strong and united community. Therefore, BUP places a strong emphasis on instilling patriotic values in its students.

University students need to remain physically, mentally, and spiritually fit. Maintaining physical, mental, and spiritual well-being is essential for overall health and a balanced lifestyle, and these are the core elements that can lead to a more fulfilling and holistic life. A student's physical fitness facilitates synchronising with all other features like mental steadiness, moral values, and regular improvement. It enriches the psychological condition. Only physical or mental fitness cannot restore each other, as these are two diverse essentials, but both complement each other. The goal of physical education is not just to win matches but to promote education through sports and physical activities. Students cannot stay vigilant unless they are physically healthy, and they cannot maintain physical fitness if they are mentally disturbed. Mental and spiritual developments stand for essential elements of education which enable students to realise social and moral responsibilities and lead a man to become a leader.

In today's phenomena, we cannot ignore the prevalence of drugs and their negative impacts on today's world. Someone may start abusing drugs, thinking they can control it at any point. But soon, in most cases, drugs start abusing the individual. For that reason, students always need to stay away from the allure of drugs and substances that can tarnish someone's future and life. Instead, students must channel their energy into positive pursuits. They should engage in healthy activities and surround themselves with friends who have positive minds to uplift and inspire. They must remember that their parents or guardians have made a lot of contributions to help them come to this stage. Students' sacred duty is to keep their parents' hopes alive and devote themselves to serving the purposes for which they are in the university.

Social media has brought a revolution in this digital age, where anyone's voice can reach a global audience at any time. The phenomenon demands that everyone behaves sensibly while posting something and reacting to any post done by anyone else. Everyone's digital footprints are perpetual. Hence, a single mistake can haunt someone for the rest of their life; therefore, one should always think carefully before clicking on any social media post. As a student of the present era, one may be habituated to using a smartphone but needs to inculcate the quality to be smarter to have control over it. Electronic gadgets must not outsmart the brilliant students studying at the university level.

Truth has a power of its own, and this era needs to speak 100% truth. It would be best to inculcate the habit of speaking the truth, even to the power. It ensures not only mental peace but also eternal peace in life and hereafter. Do not confound the truth by overlaying it with falsehood, nor knowingly conceal the truth (The Quran 2:42). It needs strong determination to develop this rare quality. Use the platform of BUP and develop this quality. There are huge differences between being able to achieve and failing to accomplish. Therefore, as a student of BUP, one should not leave any stone unturned to achieve their set objectives, which are very much possible for determined individuals.

University life will be of the most memorable and transformative for an individual's life. Students need to accept the diversity of thoughts, cultures, and experiences they are likely to encounter in BUP. All should have the fearless and open mind to engage with their peers, faculty, and staff. They are acting as students' invaluable resources on this intellectual journey. Students of BUP should immerse themselves in the vibrant campus atmosphere, participate in the events and activities, and make lifelong friendships that may contribute to shaping their future. Classroom interaction is the main mode of knowledge-sharing at the university. However, students should take advantage of resources like thelibrary, and avail the opportunity to attend seminars, workshops, and guest lectures that may be on any subject to broaden their knowledge. Students are encouraged to explore the wide range of clubs available at the university. These extracurricular activities will provide them with a platform to pursue their passion and interests and will also help them foster teamwork, leadership, and personal growth. This will enrich their university experience and widen their horizons, but freshers need to balance their involvement to avoid overwhelming themselves. Every department or any particular subject offered at the university holds immense value. Each area of study provides unique opportunities for intellectual growth and personal fulfilment.

Freshers need to remember that their dreams are the driving force that will propel them forward and shape their journey through university and beyond. Everyone should have clear academic and personal goals but should remain open to adopting them based on new experiences and opportunities. Freshers should possess the attitude to embrace positive changes and learn from the challenges. They should stay curious and open-minded and develop the mentality of lifelong learning and the art of critical thinking. As a beginner in the university, everyone needs to remember that they should embark on this path of higher education with full devotion as their parents and guardians hold greater hopes for their future. Students need to realise that his/her parents have nurtured and supported them, and their parents' dreams are intricately intertwined with their own. Parents wish to witness their sons'/daughters' growth, to see them prosper, and to witness the realisation of their potential. It's the students' duty to carry their hopes in their hearts as parents have invested their love, time, and resources to provide them with today's opportunity. The newcomers are advised to welcome the journey with gratitude and a sense of purpose. All should have a firm conviction that everyone's dreams have the power to shape their destiny.

Note: This article was previously published in ‘The Daily Star’.

Global Atmospheric Circulation

Lt Col Mohammad Mahmudur Rahman Niaz
Town Planner
Office of the Chief Planning, Development & Works

Introduction : The weather we experience on the exterior of the earth happens because of global atmospheric circulation. Atmospheric circulation is the large-scale interchange and motion between air and ocean by which thermal energy is redistributed on the surface of the globe. The atmosphere is constantly in motion.

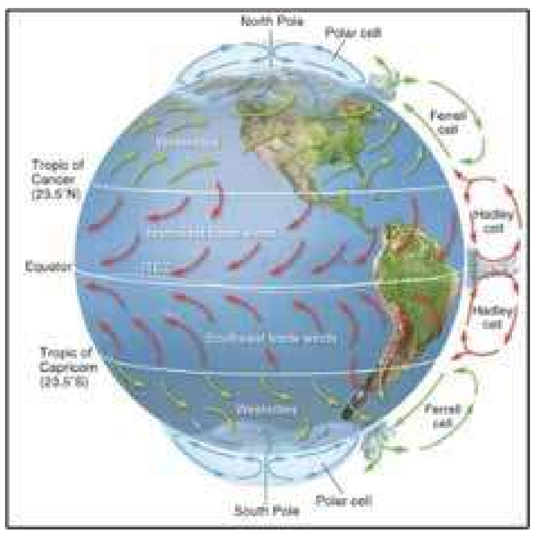

Figure 1: Global atmospheric circulation model.[1]

Air Convection : As solar energy hits the equator, the air warms and forms a low-pressure region. Subsequently, it follows three main flows between the poles and the equator. Prominent atmospheric convections are Hadley Cells, Ferrel Cell, and Polar Cell. Hadley Cells is the low latitude overturning circulations that have air rising at the equator and air dipping at roughly 30° latitude. This develops a convection cell that dominates tropical and sub-tropical climates. Ferrel Cell is a mid-latitude atmospheric circulation cell for weather. In this cell the air flows poleward and eastward near the surface and equatorward and westward at top levels. At about 60 degree latitude, this air mass strikes with another air mass arriving from the poles. The air rises after the collision and comes back at 30 degree latitude to complete the ferrel cell. A Polar Cell signifies the small circulation cell expanding from 60° north and south to the poles.

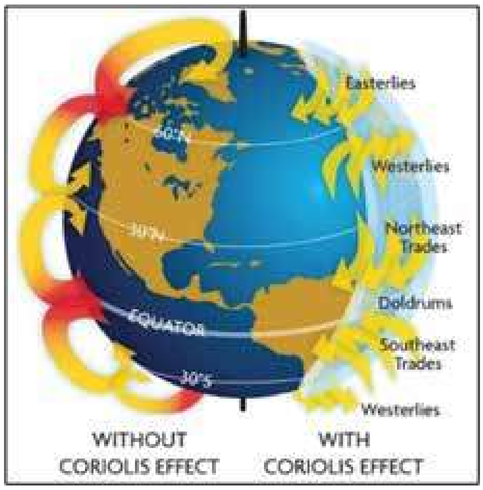

Figure 2: The Coriolis Effect.[2]

Coriolis Effect : The earth rotates quicker at the Equator than it does at the poles. Earth is larger at the Equator, so to make a rotation in one 24-hour period, equatorial regions race nearly 1,600 kilometers per hour. Near the poles, Earth rotates at a sluggish 0.00008 kilometers per hour.[3] Due to the rotation of earth circulating air deflects rightwards in the Northern Hemisphere and leftwards in the Southern Hemisphere, resulting in curved paths. This ricochet is called the Coriolis Effect. It makes storms spin clockwise in the Southern Hemisphere and counterclockwise in the Northern Hemisphere.

Figure 3: Famous local winds of the world.[4]

Famous Local Winds : Air temperature, land temperature, water temperature, mountains and geographical locations play vital roles in the circulation of wind flows around the globe. Sirocco is a hot desert wind that flows northward from the Sahara up to the Mediterranean coast of Europe. The mistral brings intense storms across the Mediterranean coast of France. The chinook, a warm and dry west wind that blows along the eastern side of the Rocky Mountains of the United States. Khamsin was first mentioned in the Bible, as blowing from the African deserts towards the Mediterranean and causes sandstorms in northern Egypt between April and June. Besides, the pampero is a surge of cold polar air from the south that flows over Argentina and Uruguay between October and January every year. Again, Harmattan is a dry wind flowing from an easterly direction over north-west Africa which brings great quantities of sand from the desert. Besides, Monsoon is a seasonal changing wind that causes rainfall in South Asia.

Reasons of Ocean Current : The main forces that influence the currents are heating by solar energy, wind, gravity, and the Coriolis Force. The secondary forces that sway the currents are temperature

difference, salinity difference. Besides, heating by solar energy causes the water to expand. So, near the equator the ocean water remains around 8 cm higher in level than in the middle latitudes. This triggers a very slight gradient and water tends to flow down the slope. The flow is normally observed from east to west. Besides, wind flowing on the face of the ocean forces the water to move. Friction between the wind and the water surface affects the transfer of the water body in its course. Winds are liable for both magnitude and direction. Coriolis Force also affects the direction of the ocean currents.

Ocean Conveyor Belt : Ocean tides are the constant and directional movement of seawater driven by gravity, wind, Coriolis Effect, and water density. Ocean waters horizontal movements are denoted as currents, while vertical alterations are called upwelling or downwelling. Varying flows of ocean water and tide affect climate, local ecosystems and seafood. Besides, differences in water density, resulting from the unevenness of water temperature and salinity also trigger ocean currents. This procedure is known as thermohaline circulation. When freezing ocean water forms ice, salt is left behind, causing adjacent seawater to become saltier and denser. Dense-cold-salty water sinks to the ocean bottom. Surface water emerges to replace the sinking water, which in turn becomes cold and salty enough to sink. This starts the global conveyer ring or belt, a connected system of immersed and surface currents that flow around the globe. This global set of the ocean currents is a complex segment of Earth's climate system as well as the ocean nutrient and carbon dioxide cycles. Oceanography studies the physical and biological properties and phenomena of the ocean. Satellites like GRACE and GOCE evaluate gravity to map out oceanic topography.

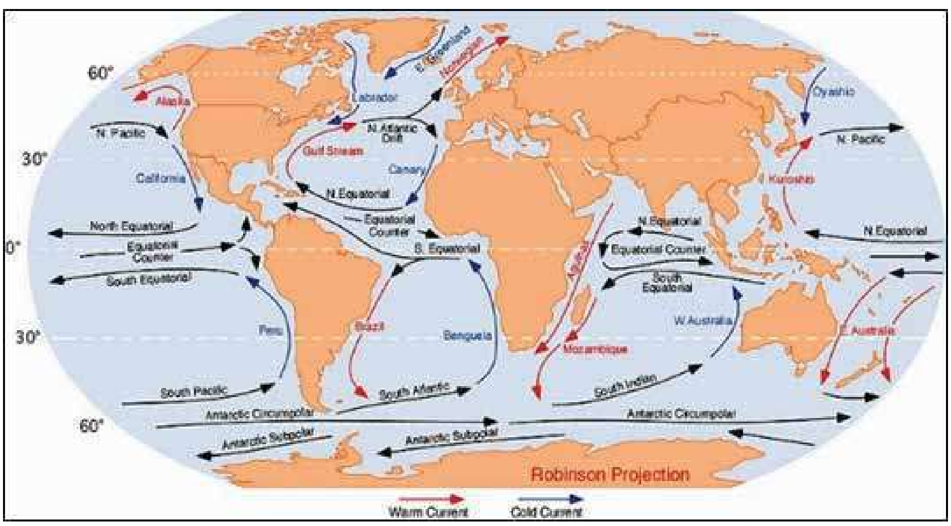

Figure 4: The general movement of the currents in the northern hemisphere is clockwise and in the southern hemisphere, anticlockwise.[5]

Major Ocean Currents : Cold currents bring cold water into warm water zones and from high latitudes to low latitudes. Currents flow in a clockwise course in the northern hemisphere and in an anticlockwise direction in southern hemisphere. The cold Humboldt Current is normally present off the coast of Chile and Peru which keeps the coast cool and northern Chile arid. Warm currents bring warm water into cold water regions. In the northern hemisphere they are found on the west coasts of continents in high latitudes. The Gulf Stream is a warm stream that originates in the Gulf of Mexico and transfers north toward Europe. The Labrador Current, which flows south out of the Arctic Ocean along the coasts of Newfoundland and Nova Scotia, is notable for transferring icebergs into shipping lanes in the North Atlantic. Besides, El Nino is an unusually warm ocean current, accompanied by severe rains and flooding. La Nina is another weather phenomenon that incorporates unusually cold ocean temperatures and pushes warm surface water to farther west than typical, creating the opposite results of El Nino. El Nino frequently affects Northern Hemisphere winter and summer climate patterns around the globe. During the summer, La Nina causes the western coast of South America and

Southeast Asia to be chillier. Moreover, the general transfer of the currents in the northern hemisphere is clockwise and in the southern hemisphere, anticlockwise. This is due to the Coriolis Force. A notable deviation to this tendency is seen in the northern part of the Indian Ocean where the current movement changes its direction in response to the seasonal variation in the direction of monsoon winds. Monsoon winds are responsible for the seasonal exchange of ocean currents in the Indian Ocean.

Mixing of Ocean Currents : Biologists and engineers are studying on the way jellies and other sea creatures may contribute to ocean mixing. Ocean mixing is the process of warm, sun-filled surface water mingling with cold, nutrient-rich bottom water. Surface currents form within 400m of the upper layer of the ocean, and this constitutes about 10 percent of all the water in the ocean. Besides, deep water currents make up the other 90 percent of ocean water. These waters move around the ocean basins due to alterations in density and gravity. Deep waters sink into the deep ocean basins at high latitudes, where the temperatures are cold enough to cause the density to increase. The merging of cold and warm ocean currents initiate foggy weather where precipitation occurs in the form of drizzle. Again, these regions bear the richest fishing zones in the world. This mixing of currents help to refill the oxygen and favor the growth of planktons, the primary food for fishes. Grand Banks around Newfoundland, Canada and the North-Eastern Coast of Japan are a few famous spots. However, upwelling is a process in which currents bring deep, cold water to the surface of the ocean. Upwelling is a result of winds and the rotation of the Earth. Upwelling generates some of the world's most fertile ecosystems. Peru, for example, undergoes continual coastal upwelling and is amomg the richest fishing zone in the world.

Shipping Routes : Most of the famous shipping lanes align with major ocean currents and winds. The trade winds blow mostly from the northeast in the Northern Hemisphere and from the southeast in the Southern Hemisphere. Trade winds have been followed by captains of sailing ships to cross the world's oceans for centuries. The North Atlantic Ocean route connects Europe and North America and follows mostly the Gulf Stream. Similarly, routes connecting Asia and North America cross the Kuroshio Current of the Pacific Ocean. Most deserts close to equator remain dry due to influence of trade winds. A ship travelling from Mexico to Philippines uses the route along the North Equatorial Drift which flows from east to west. Again, Philippines to Mexico bound ships follow route along the doldrums when there is counter equatorial current flowing from west to east.

Energy from Currents : Oceans have huge potential to be used more widely as a source of renewable energy. Some countries have already exploited the energy of ocean waves, temperature, currents, or tides to power turbines and generate electricity. Ocean current generators are working in some places in Ireland and Norway. Ocean thermal energy conversion (OTEC) uses the difference in temperature between the warm surface water and cold deep water to run an engine. Vapor is produced by the trapped heat and that in turn, operates the generator.

Conclusion : Earth rotation and heat variation are mostly responsible for weird global atmospheric circulation. This has profound effect on climate, ecosystems, shipping, fishing, energy and many economic activities. Finally, as Anthony T. Hincks said, "The Ocean has a life of its own. Its tides, whirlpools, currents and eddies are a testament to its conflicting emotions."

References:

[1]http://gmcyd.top/coriolis-effect-wind-worksheet/

[2]https://www.northcoastjournal.com/humboldt/the-coriolis-effect/Content?oid=2131286

[3]https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/coriolis-effect/12th-grade/

[4]https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/list-of-famous-local-winds-of-the-world-1501592031-1

[5]http://megha213.blogspot.com/

Electronic Public Relations Practice in this Era

Md. Jahangir Kabir
Additional Director
Public Relations, Information and Publications

Public Relations is a strategic communication process aimed at fostering mutually beneficial relationships between organizations and their target audiences. This involves managing information and influencing public perception through various channels such as media, events, and community engagement, ultimately enhancing the organization's reputation and advancing its goals. Electronic Public Relations refers to the practice of managing an organization's public image and reputation within the digital landscape. EPR uniquely promotes organizations, individuals, or entities by enhancing their visibility in a virtual environment.

Electronic Public Relations represents a crucial advancement of traditional Public Relations by harnessing digital platforms and tools to improve communication strategies. While PR emphasizes cultivating relationships between organizations and their audiences through various channels, EPR specifically employs online mediums like social media, websites, and email to engage stakeholders more effectively. This transition enables organizations to connect with a wider audience, respond in real time, and encourage interactive dialogue. By incorporating EPR into their communication strategies, organizations can boost their visibility, manage their reputations, and adapt to the fast evolving digital landscape, ensuring their PR approaches remain relevant and impactful.

In today's digital age, Electronic Public Relations is essential for how organizations interact with their audiences. With consumers increasingly turning to online platforms for information and engagement, EPR provides organizations the ability to connect with stakeholders in real time and effectively address their needs. This immediacy promotes transparency and trust, which are vital for nurturing positive relationships in a fast-moving environment. Moreover, EPR enables targeted messaging, allowing organizations to customize their communications to resonate with specific demographics and interests, thus boosting engagement. By leveraging digital tools like social media, blogs, and email newsletters, EPR not only increases an organization's visibility but also fosters dialogue and feedback, empowering consumers and enhancing brand loyalty. Ultimately, EPR is crucial for navigating the complexities of contemporary communication, helping organizations to stay relevant and responsivein a swiftly changing landscape.

Electronic Public Relations is essential for enabling two-way communication between organizations and their stakeholders. In contrast to traditional PR approaches, which typically involve one-way messaging, EPR utilizes digital platforms to promote interactive dialogues. This bidirectional communication empowers organizations to listen to their audiences, collect feedback, and quickly address concerns and questions. By engaging in discussions through social media, blogs, and emails, organizations can strengthen their relationships with stakeholders, fostering greater trust and transparency. Ultimately, integrating EPR helps organizations cultivate a more responsive and

dynamic communication environment, allowing both parties to exchange insights and collaboratively shape the narrative.

Numerous studies have highlighted the substantial impact of technology on PR operations and interactions within society. Many organizations are moving towards digital PR, increasingly relying on digital channels. This transition necessitates that Public Relations Professionals develop new skill sets. It is important to note that in today's landscape, traditional and digital PR coexist and are crucial for organizations. Modern technological advancements empower PRPs to engage with the public and targeted audiences without the limitations of geography, time, or physical boundaries. These technologies enable immediate, interactive communication, promoting real-time idea exchange.

The world is increasingly shifting toward digital, with a convergence of communication technologies. Digital media has fundamentally altered how PRPs communicate, establishing a continuous communication channel between organizations and their stakeholders. In this contemporary era, PR can no longer function in isolation due to the influence of the internet and technological advancements. It fosters bi-directional communication between organizations and their public, resulting in enhanced engagement.

However, the PR sector has undergone significant transformation due to digitalization and artificial intelligence, exceeding prior expectations. To thrive in the digital age and harness the potential of AI, PRPs must embrace new tools, strategies, and methodologies. The shift from traditional PR to digital PR has been profound.

In Bangladesh, the importance of Electronic Public Relations is rapidly increasing due to the widespread adoption of digital technology and the Internet. As the population increasingly turns to online platforms for information and communication, EPR provides organizations with a distinctive opportunity to boost their visibility and effectively engage with a variety of stakeholders.

EPR allows companies, NGOs, and government bodies to communicate instantly, enabling them to swiftly address public concerns and feedback. This immediacy enhances transparency and trust, which are essential for fostering strong relationships with the public, customers, and investors. Furthermore, EPR aids organizations in proactively managing their reputations by tracking online sentiments and responding to potential crises before they escalate.

As Bangladesh continues its integration into the global economy, EPR empowers local entities to highlight their achievements, innovations, and social contributions on an international platform. By utilizing social media, websites, and other digital channels, organizations can connect with broader audiences, particularly younger demographics that are highly active online.

In this light, EPR transcends the role of a mere communication tool; it serves as a strategic asset that enables organizations in Bangladesh to navigate the intricacies of the digital landscape, enhance stakeholders engagement, and ultimately fulfill their organizational objectives.

Lack of Interest in Data Provision Harms Bangladesh's National Development

Tahmina Sultana
Assistant Professor
Department of Business Administration in Management Studies

In Bangladesh, the general people shows a clear hesitation toward participating in surveys, especially when it involves sharing personal information. This reluctance arises from several factors, such as privacy concerns, mistrust regarding the use of the data, and a limited understanding of the survey's purpose. Unfortunately, such hesitancy can lead to considerable negative impacts for the country.

When citizens withhold their data, it leaves gaps in the information that government agencies and organizations depend on to make informed decisions. Accurate data is essential for planning and implementing effective policies in areas like healthcare, education, infrastructure, and social services. Without reliable data, these entities struggle to accurately assess the population's needs, resulting in inefficiencies and resource misallocation.

For instance, if health surveys fail to capture the true prevalence of a disease due to incomplete data, public health efforts might overlook the areas or populations that requires most attention. Likewise, if economic surveys inaccurately reflect income levels or employment statuses, poverty alleviation programs may miss the individuals who need the most support.

It is crucial for the people of Bangladesh to recognize the significance of participating in surveys and providing accurate information. Their involvement helps develop more efficient and responsive services, which in turn enhances the overall quality of life across the nation.

In Bangladesh, delivering precise data to the appropriate authorities is essential for the nation's progress and the welfare of it’s people. Reliable data forms the basis for informed decision-making, enabling the government and organizations to design, execute, and evaluate policies and programs that meet the actual needs of the population.

Conversely, providing false or misleading data can have detrimental effects. When inaccurate data is reported, it can lead to flawed policies and improper resource distribution. For example, if economic figures are exaggerated or distorted, the government might underestimate poverty rates or unemployment, resulting in insufficient social safety programs and ineffective poverty alleviation efforts. Likewise, inaccurate health data can obstruct disease control measures, as resources may be diverted from the regions that need them the most.

The impact of inaccurate data extends beyond policy failures; it can also undermine public trust in government institutions and other organizations. When citizens observe a lack of improvement in services or the mismanagement of resources, they may get increasingly hesitant to engage in future surveys or data collection efforts, perpetuating a cycle of misinformation and ineffective governance.

Every citizen should provide accurate information, as doing so plays a key role in helping the country devise effective strategies for growth and development, ultimately improving the quality of life for all.

On the other hand, spreading false information or failing to collaborate with relevant stakeholders in a socio-economic context can have widespread negative consequences. Trust in the accuracy and integrity of data is fundamental for any prosperous society, particularly in areas related to economic activities, public policies, and social welfare programs. When inaccurate data enters this system, it can lead to poor decision-making, misallocation of resources, ineffective policy execution, and even financial market instability.

In the social realm, false data can mislead public opinion and results in the creation of policies that fail to address the real needs of the population. For instance, inaccurate information about poverty levels or healthcare access can cause social programs to be misdirected, depriving vulnerable groups from essential support. This, in turn, can exacerbate inequality, fuel social unrest, and undermine social unity.

Encouraging the people of Bangladesh to provide accurate data is crucial for the country's development, policymaking, and resource distribution. As responsible citizens, it is everyone's duty to contribute to the accuracy of information that influences national decisions. Here are some key duties that need to be emphasized:

1. **Understanding the Importance of Accurate Data :** Citizens need to understand how accurate data directly influences public services, infrastructure, healthcare, and education. Reliable data ensures fair resource allocation and enables effective planning and execution of development projects.

2. **Honesty and Integrity :** Every individual has a responsibility to provide accurate and comprehensive information when participating in surveys, censuses, and other data collection efforts. Such honesty is crucial in preventing misinformation, which can result in misguided policies and the improper allocation of resources.

3. **Confidentiality and Trust :** Establishing trust between data collectors along with the people is essential. Individuals need to feel confident that their data will remain confidential and will be used exclusively for development purposes. When people trust that their information is protected, they are more inclined to engage fully and provide accurate responses.

4. **Active Participation :** Citizens are responsible for actively participating in data collection efforts. By taking part in government surveys or offering feedback to local authorities, their engagement ensures that the data gathered is thorough and accurately reflects the entire population.

5. **Educating and Spreading Awareness :** Those who recognize the significance of accurate data should make an effort to inform others in their community. By raising awareness, they can help counter misinformation and inspire more individuals to share trustworthy data.

6. **Reporting Inaccuracies :** If individuals come across errors or inaccuracies in the data, they should take responsibility for reporting these issues to the appropriate authorities. Doing so, helps uphold the integrity of the data and ensures that corrective actions can be implemented quickly.

Potatoes, Passion and Pride

Rifa Tasnia
Lecturer
Department of English

In a quiet village nestled by the lush green fields of Pirojpur, Barishal, there lived a young girl named Anika. She was a bright and curious child, always eager to learn something new. Yet, there was one skill that had always eluded her—cooking. The kitchen, with its bubbling pots and fragrant spices, seemed like a world she had yet to explore.

Anika's mother, Rina, was an excellent cook, known throughout the village for her delicious meals. Every day, Rina would prepare traditional dishes for the family, and Anika would watch from a distance, more interested in her schoolbooks than the culinary arts. However, that was all about to change.

One afternoon, as the sun hung lazily in the sky, Rina called Anika into the kitchen. "Anika, today, I want you to make aloo bharta," she said with a warm smile.

Anika blinked in surprise. "Me? But I don't know how to cook, Ma!"

Rina chuckled softly. "Everyone has to start somewhere. Aloo bharta is simple. All you need are a few boiled potatoes, some mustard oil, green chilies, onions, and salt. I'll guide you through it."

Nervously, Anika washed her hands and stepped into the kitchen, her heart beating a little faster. Rina handed her the boiled potatoes, and Anika carefully peeled them, feeling the warmth in her hands. The next step was mashing the potatoes, a task that Anika found oddly satisfying. As the soft white potatoes turned into a smooth, creamy consistency, Anika felt her confidence grow.

"Now, add a drizzle of mustard oil," Rina instructed, watching her daughter with pride. Anika poured the golden oil over the potatoes, its pungent aroma filled the room. She then finely chopped the green chilies and onions, her fingers moving with precision she didn't know she had.

As she mixed the ingredients together, Rina encouraged her to taste it. Anika hesitated, then took a small bite. The flavors burst in her mouth—the heat of the chilies, the sharpness of the onions, the earthy comfort of the potatoes, and the unmistakable punch of mustard oil. It was simple yet comforting, and to her surprise, Anika found herself enjoying the process.

When the dish was finally ready, Anika scooped it into a bowl and presented it to her family at dinner. They gathered around the table, curious and excited to taste her creation. Anika watched nervously as her father took the first bite.

"This is wonderful, Anika!" her father exclaimed, his eyes lighting up with delight. "It's just like your mother's."

Her siblings nodded in agreement, digging into the dish with gusto. Anika felt a warm glow of pride spread through her. She had done it—she had made something with her own hands that brought joy to the family.

As the days went by, Anika found herself drawn to the kitchen more and more. She began experimenting with different recipes, adding her own twist to traditional dishes. Cooking became a way for her to express herself, a new passion she hadn't known she had.

She loved the way her family smiled and praised her for her efforts, and the way food brought them all together. It wasn't just about feeding them—it was about sharing love, laughter, and moments that would be cherished forever.

Before long, Anika's culinary skills became the talk of the village. Her mother beamed with pride as she watched her daughter blossom into a talented cook. Anika's journey had started with a simple dish of aloo bharta, but it had opened up a whole new world to her, one where she could create, share, and spread happiness through the art of cooking.

And so, in that small village, a young girl discovered that her love for cooking was not just about the food—it was about the joy of feeding the people she loved, a joy that would stay with her for the rest of her life.

Safe Havens Reclaimed: The Family's Role Beyond Old Age Homes

Jannatul Bakia Jeni
Lecturer
Department of Sociology

Family is the cornerstone of human life, providing support, love, and a sense of belonging throughout all the stages of our existence. From childhood to the golden years, the family remains a vital source of emotional and physical well-being. In recent times, however, there has been a noticeable increase in the number of old-age homes, reflecting a shift in societal values and familial responsibilities. This trend raises critical questions about the role of family and the importance of maintaining strong familial bonds, especially as we age. From a sociological perspective, the rise of old-age homes and the increasing trend of placing elderly individuals in institutional settings reflect profound shifts in societal values, family dynamics, and the structure of care systems. The notion that "family should be our true haven" rather than old-age homes is deeply rooted in sociological theories concerning familial roles, social support systems, and cultural values.

In sociological terms, the family is considered a primary social institution responsible for socializing individuals, providing emotional support, and fulfilling various social roles. Traditionally, families have been the central unit for caregiving across the lifespan, including in old age. Functionalist perspectives argue that the family plays a crucial role in maintaining social stability and cohesion by ensuring that members are cared for and supported through different life stages. When elderly individuals are placed in old-age homes, there is a shift in these traditional roles, which can disrupt the social fabric and lead to feelings of isolation and marginalization among the elderly.

Modernization and industrialization have significantly transformed family structures and dynamics. The shift from extended to nuclear families, coupled with increased mobility and changes in economic patterns, has altered how care responsibilities are distributed. Sociological theories on modernization suggest that as societies evolve, traditional family roles and support systems are challenged by new social arrangements and institutional solutions. This transformation can sometimes lead to the outsourcing of familial responsibilities to institutions like old-age homes. Social capital theory emphasizes the value of social networks and relationships in providing support and resources. Families, as networks of intimate relationships, offers a form of social capital that is not easily replicated by institutional settings. Cultural sociology explores how cultural values and norms shape attitudes toward aging and caregiving. In many cultures, the concept of filial piety and respect for elders is deeply ingrained, emphasizing the responsibility of family members to care for their aging relatives. However, this shift often overlooks the social and emotional benefits of maintaining family-based care, which are integral to the well-being of elderly individuals.

To create a society where family is the primary support system for the elderly, a shift in mindset is essential. We must promote values that prioritize familial responsibilities and encourage a culture of

care and respect for the elderly. This can be achieved through education, community support programs, and policies that provide financial and social incentives for families to care for their aging members at home. Governments and organizations should also invest in resources that assist families in providing this care, such as respite care services, counseling, and financial assistance. Moreover, intergenerational living arrangements should be encouraged, where multiple generations live under one roof. This not only provides practical benefits, such as shared expenses and caregiving duties but also fosters a supportive environment where family members can share experiences and wisdom. Such arrangements helps to mitigate the feelings of isolation and abandonment that many elderly individuals face in old age homes.

So, while old age homes may offer a temporary solution for the care of elderly individuals, they cannot replace the unique and invaluable support that a family provides. The family should be our true haven, where the elderly are cherished, respected, and cared for with love and compassion. By strengthening familial bonds and promoting a culture of care, we can ensure that our elderly population lives their final years in dignity and comfort, surrounded by those who love them. Addressing this issue requires a shift in our societal mentality. We must instill it in every family members from the youngest to the oldest, the values of respect and love. By ensuring the safety and mental peace of elderly individuals within the family setting, we can build a healthier and more harmonious society. The family should be the bedrock of support and care for the elderly. Instead of isolating them in old age homes, integrating them within the familial structure ensures their well- being and dignity. As a society, we must strive to uphold the sanctity of the family as the primary source of comfort and security for our elderly, ensuring their twilight years are filled with love, respect, and happiness.

"When twilight falls and shadows grow long,
it is not the cold walls of an institution,
But the warmth of familiar arms that carry us home.
Family, a haven, where love's light remains strong."

These lines encapsulate the sentiment that family, rather than an old age home, provides the true solace and security that elderly individuals seek. The emotional resonance of family care cannot be replicated by institutional settings, which often lack the personal touch and emotional connection intrinsic to familial bonds. In conclusion, while old age homes may offer a practical solution for elderly care, they cannot replace the profound and irreplaceable support that family provides. From a sociological perspective, the family remains the true haven, offering emotional, social, and practical support that institutional care often lacks. By reinforcing the role of family and supporting family caregiving, we can ensure that elderly individuals experience their later years with dignity, respect, and the warmth of familial love.

References:

1. Giddens, A., Duneier, M., Appelbaum, R. P., & Carr, D. (2017). Introduction to Sociology (10th ed.). W.W. Norton & Company.
2. Bengtson, V. L., & Achenbaum, W. A. (Eds.). (1993). The changing contract across generations. Transaction Publishers. Macionis, J. J. (2017). Sociology (16th ed.). Pearson.

Navigating the Moral Maze: Ethical Dilemmas in Modern Marketing

Ashik Abdullah
Lecturer
Department of Business Administration in Marketing

In the contemporary digital age, the landscape of marketing has undergone a profound transformation. While the core objective of attracting and retaining customers persists, the tools and strategies employed have evolved dramatically. The advent of social media, big data, artificial intelligence, and personalized advertising has opened novel avenues for brands to connect with consumers. However, these advancements have also given rise to significant ethical dilemmas. As businesses traverse this intricate moral labyrinth, they often find themselves at a crossroads where profit-driven motivations clash with ethical considerations.

The Temptation of Data : How Much Is Too Much?

At the heart of modern marketing, lies the allure of data. Brands amass vast quantities of information about their customers, encompassing shopping habits, social media behaviour, personal preferences, and location data. This data empowers marketers to craft highly personalized advertisements, enhancing engagement and boosting sales. But this seductive power comes at a cost.

In Bangladesh, data privacy has emerged as a critical concern. Telecom giants like Grameenphone and Robi have faced allegations of sharing customer’s data with third-party advertisers. These firms argue that data-sharing facilitates personalized services, but many consumers remain oblivious to how their personal information is being utilized. This creates a significant ethical dilemma regarding consumer’s consent and privacy.

The Utilitarianism approach suggests that actions should be judged based on their consequences. While companies may assert that data-sharing benefits consumers by providing relevant offers, the erosion of trust due to privacy violations could inflict more harm in the long run. Marketers in Bangladesh must tread a fine line between personalization and privacy protection to maintain ethical practices.

Manipulation or Engagement?

Another ethical challenge in modern marketing lies in the delicate balance between persuasion and manipulation. Advertising has always been about convincing consumers to buy products, but in recent years, brands have adopted psychological techniques that can subtly manipulate consumer behaviour without their conscious awareness.

In Bangladesh, e-commerce platforms such as Daraz often employ urgency tactics like flash sales and countdown timers to drive quick decisions. These tactics can induce consumers to feel pressured to purchase without adequate reflection, potentially leading to buyer's remorse. In some cases, websites even employ dark patterns, making it difficult for users to unsubscribe or cancel services.

This practice can be examined through deontological ethics, which argues that actions should adhere to ethical duties and principles regardless of their consequences. In this context, brands have to respect consumers' autonomy and provide transparent information. While manipulative tactics may boost short-term sales, they risk undermining consumer trust in the long term. Ethical marketing practices should prioritize transparency and allow consumers to make informed decisions.

Social Media and Influencer Marketing : The Blurred Lines of Authenticity

The rise of social media has transformed the marketing landscape, offering brands direct access to consumers like never before. One of the most popular trends in digital marketing is influencer marketing. Where brands collaborate with individuals who have large social media followings to promote their products. While this form of marketing can be effective, it raises concerns about transparency and authenticity.

In Bangladesh, influencers often promote products ranging from beauty items to technology gadgets without clear disclosure of paid endorsements. Many followers believe these recommendations are genuine, when, in fact, they are financially motivated. This creates a moral dilemma, as consumers may be misled into making purchasing decisions based on incomplete information.

Kantian ethics, another deontological theory, Say's that individuals should be treated as ends in themselves, not as means to an end. When influencers hide paid promotions, they treat their audience as a means to generate profit without respecting their right to transparency. To uphold ethical standards, influencers and brands in Bangladesh should disclose their partnerships, ensuring that consumers can make informed decisions.

Greenwashing : A Mask of Sustainability

As consumers become more environmentally conscious, many companies have embraced sustainability as a core part of their marketing strategies. While this is a positive development, it has also given rise to a phenomenon known as greenwashing, the practice of making false or exaggerated claims about a company's environmental efforts to appear more eco-friendly than they are.

In Bangladesh, the Ready-Made Garment (RMG) sector is an example, where greenwashing can be observed. Some manufacturers have claimed to use sustainable materials or follow ethical labour practices, but investigations have revealed discrepancies between these claims and actual practices. By misleading consumers, these companies exploit the growing demand for eco-friendly products without making substantial changes to their operations.

The concept of Corporate Social Responsibility (CSR) is critical in addressing these ethical issues. CSR emphasizes that businesses should act in ways that help society, not just shareholders.

Greenwashing undermines CSR by deceiving consumers into believing they are making environmentally responsible choices. To maintain ethical marketing, companies in Bangladesh must ensure their sustainability claims are genuine and backed by concrete actions.

The Road Ahead : Beyond the Bottom Line

As marketing continues to evolve in the digital age, ethical dilemmas will undoubtedly persist. Brands will be faced with difficult decisions, from respecting consumer privacy to maintaining transparency and avoiding manipulative tactics. While the temptation to prioritize profits may be strong, businesses that fail to address these ethical concerns risk damaging their reputations and losing consumer trust.

Ultimately, the goal of ethical marketing is to foster a relationship of mutual respect and trust between brands and consumers. By adopting ethical practices and being transparent about their intentions, companies can not only drive long-term success but also contribute to a more honest and fairer marketplace. The moral maze of modern marketing is challenging to navigate, however, the brands that do so with integrity will emerge as leaders in the industry.

Transforming Universities: The Significance of Outcome-Based Education (OBE) in the Era of the Fourth Industrial Revolution

Mafi Rahman
Lecturer
Department of Business Administration-General

The Fourth Industrial Revolution (4IR) has introduced a significant shift in the global job market, characterized by the integration of artificial intelligence (AI), automation of the Internet of Things (IoT), and advanced data analytics into everyday business operations. As a result, the traditional skill set expected from business graduates is rapidly evolving. Employers are now looking for individuals who possess a well-rounded blend of soft and hard skills. In this context, Outcome-Based Education (OBE) has emerged as a critical tool to ensure that business graduates are adequately prepared for the challenges of the 4IR.

The Changing Job Market : A New Skillset

In the era of automation and AI-driven technologies, soft skills are increasingly important for business graduates. Some of the key skills that are essential for success in this dynamic environment include:

- **Critical Thinking and Problem Solving :** As businesses become more data-driven, employees must be able to analyze complex information, make informed decisions, and creatively solve problems. Graduates need to be adept at critical thinking, allowing them to evaluate multiple perspectives and develop innovative solutions.
- **Adaptability and Resilience :** With constant technological advancements, the ability to adapt to changes is crucial. Employers value individuals who can quickly learn new skills, adjust to shifting market demands, and remain resilient in the face of uncertainty.
- **Emotional Intelligence :** While machines and algorithms can process data, they cannot replicate the human ability to understand, manage, and respond to emotions. Emotional intelligence is essential for leadership, teamwork, and client management roles, as it allows graduates to effectively communicate, collaborate, and build relationships.
- **Collaboration and Teamwork** : In the 4IR, businesses increasingly rely on cross-functional teams, often distributed across geographical boundaries. Graduates must excel in collaboration,

OBE: A Response to the Skills Gap

Outcome-Based Education (OBE) has emerged as a transformative educational model in response to the evolving demands of the 4IR. Unlike traditional education models that focus on theory and rote memorization, OBE centers around achieving specific competencies by the time students graduate.

- **Real-World Application :** One of the key strengths of OBE is its emphasis on practical application. By designing courses around specific, measurable outcomes, universities can ensure that graduates are not only proficient in academic theory but also capable of solving real-world business challenges. For instance, in a business program, students might be tasked with analyzing a company's financial health and proposing strategic solutions, thereby honing their critical thinking and problem-solving skills.

- **Continuous Assessment and Growth :** In an OBE system, students are continuously assessed on their progress toward achieving defined outcomes. This method of ongoing feedback encourages a growth mindset, where students are more focused on improving their skills than merely passing exams.

- **Holistic Development :** OBE promotes the holistic development of the students by incorporating soft skills training alongside technical knowledge. OBE programs incorporate internships, group projects, case studies, and real-world problem-solving exercises, all of which enable students to develop the emotional intelligence, adaptability, and leadership skills required in the modern workplace.

Preparing Bangladeshi Universities for the Future

Universities in Bangladesh have a pivotal role to play in preparing business graduates for the demands of the 4IR. While some universities have begun to adopt OBE frameworks, there is still much progress to be made in fully integrating this approach into higher education curriculum across the country. The following measures are essential for universities to ensure that graduates are equipped with the necessary skills:

- **Curriculum Reform :** To align with the principles of OBE, universities in Bangladesh need to reform their business programs to include more outcome-focused learning experiences. This might involve revising course content, updating teaching methods, and incorporating more project-based learning, internships, and industry partnerships.

- **Industry Collaboration :** Strong partnerships between universities and industries are essential for ensuring that academic programs remain relevant to the needs of employers. By collaborating with businesses, universities can develop curriculum that address current industry trends, giving students hands-on experience with emerging technologies, data analytics, and leadership challenges.

- **Faculty Development :** To successfully implement OBE, faculty members need to be trained in this new pedagogical approach. Universities need to invest in professional development programs to ensure that professors and instructors are capable of designing outcome-based courses and providing the necessary guidance and feedback to students.

- **Emphasis on Soft Skills Development :** Many Bangladeshi universities still prioritize theoretical knowledge over soft skills training. To better prepare students for the demands of the 4IR; universities should incorporate courses and workshops on critical thinking, emotional intelligence, teamwork, and communication into their business programs.

- **Technology Integration :** Given the technological nature of the 4IR, universities in Bangladesh must ensure that their students are proficient in digital tools and platforms. Integrating technology into the learning process will not only enhance students' technical abilities but also improve their adaptability in a tech-driven environment.

Future Directions: Leading the Way in 4IR

As the 4IR continues to transform industries worldwide, business graduates must be equipped with a unique blend of technical and soft skills to succeed in the rapidly changing job market. OBE offers a promising solution by focusing on measurable learning outcomes and real-world applications. Universities in Bangladesh have a critical role to play in adopting this approach, ensuring that their graduates are not only academically competent but also capable of thriving in a digital, interconnected, and fast-paced business environment.

From Ballot to Decree: The Coercion of Power is Inevitable

Md. Tanvir Mahtab
Lecturer
Department of Sociology

The struggle between autocracy and democracy has been the focus of a great deal of attention, discussion, and even conflict throughout human history. People tend to conceptualize dictatorships as political structures that consist of power being vested in the hands of a single person or a small group while also lacking substantial mechanisms of checks and balances. The decision-making process is often hierarchical, with authority and control, originating from higher levels. In certain circumstances, individual liberties may be restricted to prioritize the collective welfare or the common good. In contrast, democracy is commonly seen as a form of administration in which authority is decentralized, and the influence of the populace is highly valued. Ideally, decisions are determined by a process of agreement or majority rule to protect individual liberty. Nevertheless, when societies vacillate between these two poles or even amalgamate attributes of both, a more profound inquiry arises: regardless of the system, does the essence of power possess an inherent coercive quality? The subject of inspection may not solely lie in the system itself but also in the unregulated use of power inside any given system.

The perennial discourse around the comparison between dictatorship and democracy frequently revolves around divergent principles, namely the dichotomy of repression vs liberty, the juxtaposition of a sole authoritative figure with a multitude of voices, and the difference between oppression and representation. However, it may be argued that this binary distinction between black and white is fundamentally erroneous. The discussion postulates the existence of a rigid boundary between these two systems, although the demarcation between them is indistinct. Despite the numerous assurances of liberty and engagement, democratic systems occasionally, encounter a phenomenon known as the tyranny of the majority, when the prevalence of populist feelings can lead to the suppression of minority perspectives. In a like vein, several autocratic regimes have had episodes of economic expansion and stability, frequently ascribed to the efficacy of centralized decision-making processes. Moreover, it is worth noting that both systems are susceptible to manipulation by influential individuals or groups, sometimes referred to as the powerful elite, who frequently exert considerable influence covertly. The essential issue at hand does not revolve around the intrinsic superiority of any system but rather concerns the manifestation of power dynamics inside a specific system. Power is a fundamental factor that exists in both tyranny and democracy, and its ability to compel, sway, and mold is universally present. Engaging in a discourse on the relative advantages of one system over another becomes an exercise in futility when the fundamental concern, namely the unregulated and disproportionate use of authority, remains predominantly unattended in both systems. Rather than prioritizing the endorsement of a certain system, it is more advantageous to redirect attention toward implementing procedures that effectively mitigate the possibility of abuses of power within any governance paradigm.

The inclination of power towards coercion is profoundly ingrained in social and anthropological foundations. Fundamentally, power is more than mere dominance; it encompasses control, influence, and the capacity to change societal narratives and realities. The notion of "symbolic violence" proposed by French sociologist Pierre Bourdieu offers valuable insights when examined through a sociological lens. The individual proposed that power is not just manifested through explicit physical coercion or immediate authority. In many instances, societies frequently acquiesce to forms of dominance through nuanced and symbolic mechanisms, such as language, conventions, and ideologies. Even within democratic societies that purport to uphold and promote freedoms, these symbolic institutions have the potential to exert pressure on individuals to adhere to prevailing norms, therefore marginalizing alternatives or minority perspectives.

Within the existing framework of the global power system, the intricacies of capitalism serve to complicate the phenomenon of coercion. Further the influence exerted by multinational businesses and financial institutions on both dictatorships and democracies frequently results in the prioritization of financial interests over democratic values. For instance, although their professed objectives of providing economic assistance, international organizations like the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank have faced criticism for implementing policies that prioritize the interests of the global elite while disregarding the welfare of the local communities.

The advent of the digital age introduces a novel aspect to this coercive phenomenon. Technology industry leaders promote a vision of increased global connectivity; but their platforms have increasingly been utilized as instruments for monitoring, manipulation of information, and the stifling of opposition. The Cambridge Analytica incident, which involved the purported utilization of personal data to sway voters, offers a poignant illustration that power may act covertly and coercively even inside democratic systems. Moreover, the current global surge of populism serves as evidence that in democratic countries, influential organizations possess the ability to exploit ingrained anxieties and biases. They possess the ability to tactfully manipulate whole communities into endorsing policies or activities that may not align with their optimal long-term welfare.

Finally, the impact of media, which is frequently under the direction or significant influence of influential stakeholders, plays a role in shaping public opinion. This serves as an additional illustration of how power may be exercised surreptitiously inside any system of government. Rather than fostering a free marketplace of ideas, narratives are carefully curated and channeled, guiding societies toward specific perspectives.

In summary, although the outward manifestations of authority may differ between a dictatorship and a democracy, the fundamental nature of coercion remains unchanged. The influence of many systems, narratives, and even the subconscious mind is deeply ingrained throughout communities, exerting a pervasive, though sometimes imperceptible, impact. The contemporary predicament faced by society is not just centred upon acknowledging the presence of coercion but also involves the ongoing effort to minimize its adverse effects.

THE WALL

Tasnim Naz Chowa
Lecturer
Department of English

I always found the wall opposite my house to be revolting. It was moss-strewn, dirty, and full of piss marks. I'm pretty sure that the entire town of men had a go at that wall. Furthermore, there was betel juice laced all around that wall. Someone had obscenely drawn the male anatomy at it's side. The wall was old, there were cracks and crevices at each corner. It made the otherwise nice neighborhood look drab. I was not too fond of that wall. Every time I looked out the window, I saw the ugliness that it was and I winced.

Years had passed and the wall remained as a reminder of my growth. As I grew, the wall grew dirtier; more scraggly. People say, you learn to love old things, but I couldn't find myself ever loving that piece of concrete.

That is until the revolution started.

On the 25th of July, 2024' I looked out the window and something looked different. Someone had spray painted across the dirty wall,

"Arek Falgun e amra abar digun hobo." [In another Falgun, we shall become double]

It was written in juvenile and messy handwriting with a spelling mistake that stood out. But something about the writing made the wall more appealing than before. There were still the paan marks and the moss around the periphery of the wall, but thank God the spray paint had covered up the male obscenity.

A few more weary days passed on and I would look out the window into the old wall and learn to appreciate the linguistic error in that very Zahir Raihan line. It glowed in the sodium light of the lamppost in neon colors. One day, amid a nationwide internet shutdown, I looked out the window and saw teenage boys playing cricket up against the wall. They had drawn three thin lines representing wickets just below the Zahir Raihan quote. I don't remember the last time I saw boys playing outside, much less against this dreary wall. In a moment of excitement, their ball touched one of the three stamps and the player was bold-out. I cheered along with the teenage boys, and I clapped my hands in utter glee.

A few more days passed and the internet came and went. Helicopters and choppers were circling over our roofs routinely. I heard what seemed like gunshots (but it could've been anything else) at a distance. There were masses of people on the streets, frantically running away from bullets, and it all seemed too close to be true. I didn't look out my window because I didn't want the fables to turn into my reality. I was afraid of seeing the horrors that we were taught to shield ourselves from. Even as I slept, I heard phantom of gunshots. I didn't know whether the sound I heard was real, or if it was the figment of my imagination.

As strange as it is, I missed the old wall and the misspelled quote strewn across it. So one day, I looked out the window and gasped in horror. There was a thin line of blood splattered across the wall. The quote was tainted in blood red. Someone had been shot here! I couldn't look away, it was enticing, like watching

something forbidden as a child. The thin line of blood traced the dirty green moss in crimson red. The blood concentrated around the spelling error. A mistake had been made here, a grave mistake. For an eternity, I looked across that line of blood and the wall morphed into something gothic and nightmarish. I was no longer fascinated by it, but repulsed.

I didn't look out my window for many days since then. Until the day when the celebration started. There was an addictive commotion outside my window and I finally caved and peeked out. Lines of what felt like millions of people celebrated on the streets with the Bangladeshi flag hoisted high above their heads. There was cheering, joy, and laughter all around. Taking opportunity of the crowd, a tea seller mama had set up shop against the old wall, with a rusty flask at hand, serving people milk tea in one-time cups. People blew on their tea, leaned against the wall, and chattered endlessly. But the blood stain across the wall still shone like a bright warning sign of sacrifice. It sent shivers down my spine, I couldn't stand near that window for too long without imagining the person whose blood-tainted my existence.

A few days came and went and the blood stained wall slowly left my memory. I got busy, with everything up and running again and I forgot to look out my window. Until one day I heard a host of giggles and laughter outside my house. I looked out and was surprised to find the old wall in a completely new attire. A bunch of University students had painted over the wall with bright neon colors, and a very profound quote readout-

"Ei falgun-e amra digun hoyechi." [In this Falgun, we have doubled]

There were no spelling errors, no moss, no cracks around the corner, and no male obscenity. More importantly, the students had painted over the blood-splattered line, they had drawn flowers circling the blood, commemorating it without erasing its existence. The wall across my window looked brand new, it glowed with the promise of its bright colors. I looked out my window for hours and marveled at this dreary old wall. The Zahir Raihan quote glowed under the setting sun.

I chuckled to myself, "Well, maybe you really can learn to love old things."

Is Your Mind Persuaded by Rumours?

It is our responsibility to be careful regarding Rumours

Muhammad Kawsar Mahmud
PhD Researcher

Image Source : Internet

A rumour is an unsubstantiated piece of information or narrative that is disseminated among individuals, frequently via oral communication or social media platforms. Rumours can spread quickly and may pertain to a variety of subjects, such as events, personal information, or public issues. They often arise in the absence of clear, confirmed information and can sometimes lead to misinformation and misunderstandings. Because rumours are not substantiated by reliable evidence, they can be misleading or false, though occasionally they may contain some elements of truth.

Currently, social media has completely transformed the way individuals communicate, providing a platform for immediate dissemination of information and engagement. The swift transmission of information has also enabled the proliferation of rumours. The rapid and effortless dissemination of content on sites such as Facebook, Twitter, and Instagram enables unverified information to quickly reach a wide audience within minutes. Individuals, frequently motivated by the need to stay informed or spread sensational information, may unintentionally spread rumours without confirming their accuracy[1].

Rumours can have profoundly negative effects on students, impacting their emotional well-being, academic performance, and social life. When a rumour spreads about a student, it can lead to feelings

of isolation, anxiety, and depression. The stress of dealing with false or exaggerated information can distract from studies, resulting in lower grades and a decline in academic achievement.

Socially, rumours can damage relationships and reputations, causing a student to lose friends and be ostracized by peers. This social exclusion can lead to a lack of support and companionship, making school life challenging and lonely. The emotional toll of dealing with rumours can also affect a student's self-esteem and confidence, which are crucial for personal development and success.

Students must comprehend the detrimental consequences of rumours and refrain from disseminating unsubstantiated information. By providing mutual support and cultivating a school environment that values respect and inclusivity, we can effectively reduce the adverse effects of rumours and create a happy and thriving community for all students.

Rumours can greatly exacerbate social instability by disseminating false information, fostering mistrust, and provoking fear. Dissemination of erroneous information can result in extensive perplexity and apprehension, eroding public trust in organizations and authority. The gradual decline in trust can lead to the disruption of social cohesion, as individuals may develop a sense of suspicion towards one another and authoritative sources of information.

In times of crisis, such as, during natural disasters or public health emergencies, rumours can exacerbate the situation by leading to irrational behaviour, such as, panic buying, hoarding, or even violence. Misleading information can also hinder effective response efforts by diverting attention and resources away from critical needs. For example, during a pandemic, rumours about treatments or the severity of the situation can result in people ignoring public health advice, thereby worsening the spread of the disease.

Moreover, rumours can fuel social tensions and conflicts by spreading inflammatory or divisive content. False narratives about different communities, ethnic groups, or political entities can incite hatred and provoke violent confrontations, further destabilizing society.

In Bangladesh, many rumours or concocted news circulate throughout the country, leading to the emergence of conflicts. It is the primary duty of any institution to suppress this rumour and provide clarification for every incidence. Certain individuals intentionally spread false information about Bangladesh Army to cause instability. The Inter Service Public Relations (ISPR) Directorate, a media and news agency representing the Bangladesh Armed Forces, issued clarifications to avoid any misinterpretation[2]. There was a prevailing misconception that a one-taka coin contained valuable metal, resulting in reports of the currency being exchanged for sums ranging from Tk 10 to 300. The issue has emerged as a result of the news regarding a little rise in the price of copper, which is the main component of the currency, in the international market. Then Bangladesh Bank demonstrated its significance[3].

In the domain of the stock market, many individuals are enticed by rumours and thus suffer financial losses in their investments. The Regulatory Body of DSE and CSE has often cautioned against giving credence to rumours[4]. There is another report of boundary pillars that were installed underground during British control to protect people from lightning strikes, as these pillars are capable of absorbing electrical energy. The perpetrators suggest that the pillar is being sold on the black market at a significant price. Following that, the administration issued a press statement detailing its elements and advising individuals to abstain from spreading false information[5]. Several individuals endeavoured to impede the construction of the Padma Bridge, the most extensive infrastructure undertaking in Bangladesh, by spreading the belief that human lives were necessary for its completion, utilizing

social media as a medium. Later, the regulatory authority clarified the false information and warned individuals to be cautious[6].

In light of the above discussion, some recommendations can be drawn as follows:

1. **Do Not Spread Rumours :** If you hear something that sounds like a rumour, do not repeat it or share it with others. Disseminating unverified material might result in harm and generate superfluous drama.

2. **Verify Information :** Before believing or sharing any information, take the time to verify its accuracy, authenticity. Check with reliable sources or go directly to the person involved to get the facts.

3. **Challenge and Correct Rumours :** If you hear and identify a rumour, challenge it. Politely ask the person spreading the rumour if they have verified the information. If you know the rumour to be false, request that person immediately and provide accurate information.

4. **Show Empathy and Support :** Understand that rumours can be hurtful and damaging to those involved. Show empathy and support to anyone who might be affected by a rumour. Offer your support and let them know that you do not believe the false information.

5. **Promote a Positive Environment :** Foster an environment of trust and respect. Encourage open communication and discourage gossip and rumours. By creating a positive atmosphere, you help to prevent the spread of misinformation.

6. **Report Harmful Rumours :** If a rumour is particularly harmful or damaging, report it to a teacher, counsellor, or school administrator. They can help address the situation and provide support to those affected.

References :

[1]https://www.bartleby.com/essay/Rumors-F3JZDNAYTC
[2]https://www.thedailystar.net/bangladesh-national-election-2018/ispr-statement-warns-against propaganda-against-bangladesh-army-in-social-media-1678237.
[3]http://archive.prothom-alo.com/detail/date/2010-11-24/news/110732
[4]https://www.thedailystar.net/business/news/rumours-deflated-stock-market-finance-minister-1848 736
[5]https://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/58851
[6]https://www.daily-sun.com/post/406007/2019/07/10/Rumor-seeking-human-heads-for-Padma- Bridge

Europe Guide 2023: A Journey of Conviction and Sufferance

Mst. Dilshad Sharmin Chowdhury
Assistant Director
Office of the International Affairs

It was a fine and sunny day when we touched down at Arlanda Airport in Sweden at 02:40, Swedish time. The deliberation of the weather mirrored the pleasant incidents we were about to experience, though getting here had been a whirlwind of events. This was the beginning of a journey that we had dreamt of for months, but the road to this point had been anything but smooth.

When the idea of visiting Europe was first brought up, it felt like a distant dream, especially for me and my daughter. It was our very first trip outside the country, and the excitement was almost overwhelming. This wasn't just any ordinary trip for us as it was that continent I had always dreamt of exploring. The butterflies in my stomach never settled as we prepared for this much-anticipated adventure. It was a family tour wrapped around my husband's official work, and everything seemed to align perfectly. But as the days got closer, the reality of making this dream come true turned into an anxiety.

The weeks leading up to our departure were filled with a mix of excitement and sleepless nights. Every day brought new things to prepare for packing, planning, organizing documents, and at the back of my mind, the ever-present thought: Would everything go according to plan? But the most nerve-wracking part was applying for the visa, and that didn't happen as smoothly as we had hoped.

We finally managed to apply for our visas just 19 days before our departure. This was cutting it close, especially for such a significant tour, but we were hopeful. I gathered all the required documents; my No Objection Certificate (NOC), bank statements, and everything that would prove my eligibility to travel. But, as first-time visitors, we made an error. We had included a detailed itinerary of our plans to visit Sweden, Switzerland, and France, which led to confusion on the embassy's end. To our utter disappointment, our visa application was denied.

That moment was crushing. Especially for my husband, who had been planning this trip for so long. He had been dreaming of combining his work tour with a family vacation, and everything seemed to unravel at the last minute. The denial left us in shock and disbelief. Our tickets were booked, our bags were packed, and our hearts were set on this trip. Yet, in the face of this setback, he didn't give up. He gathered the strength and determination to act quickly, and within just a day and a half, he prepared a new and stronger visa application.

This time, we approached the process with more precision. We excluded the detailed itinerary and added additional documents, including contact information for relatives in Europe, their ID cards, and a cover letter explaining my responsibilities as a government employee and the strong reasons I had to return to Bangladesh. Every piece of paper added weight to our application, and we prayed that this time, it would be enough. During those tense days, the uncertainty weighed heavily on us.

Every morning, my little girl would wake up and ask me, "Ma, when will we go?" Her innocent excitement made the waiting even harder. We didn't know whether we would receive the visa in time. Then, Alhamdulillah, by the grace of Allah, we received the news we had been praying for: our visas were approved! The relief and joy were indescribable. It felt like the first obstacle had been overcome, and the road to our dream was finally clear. But, as we would soon discover, the challenges were not over yet.

Upon arriving at Arlanda Airport, another unexpected hurdle awaited us. As we proceeded through immigration, the officials pulled us aside. There was an issue with my husband's stay permit from his previous trips. Although he had travelled to Sweden many times before for his official work, there had been a mistake in his visa as he was only authorized to stay for 10 days during his previous visit, but he had stayed longer for a second event organized by the Swedish government. Neither the Swedish airport officials nor the visa authorities had noticed this error during that time, and yet, they had issued him a new visa. We were held at the airport for what felt like hours, though it was actually around 90 minutes. The tension was suffocating. My husband, usually calm and composed, was visibly shaken when holding my hands tightly.

Despite the biting cold, beads of sweat formed on his forehead, a sign of the anxiety he was trying so hard to conceal. Each passing moment stretched into eternity in the fear of being turned back to Bangladesh from the Airport. "Whatever happens, Allah will make it easy for us," I whispered, though deep down, I, too, was unsure of how things would unfold. After what felt like an eternity, the officials returned with a respectful apology. They acknowledged that there had been an oversight on their part and that they should have caught the issue earlier. However, they gently reminded my husband that it was also his responsibility to check the stay permit. Despite the confusion, they graciously allowed us to enter Sweden. The moment we emerged from the airport, a sense of relief swept over me. We had made it finally!

This trip wasn't just about visiting a new place; it was about overcoming challenges with Allah's mercy, trusting in Allah's plan, and celebrating the power of family. The journey that had begun with tension and uncertainty transformed into one of joy, discovery, and countless blessings with His blessings.

As we stepped into this new chapter of our journey, it was time to truly explore Europe. From the charming streets of Stockholm to the breathtaking views of Paris, each moment was an adventure waiting to unfold. But those stories—of Sweden's serene beauty and France's vibrant allure, are tales for another day, perhaps to be shared in my next writing.

United Hearts for Love & Struggle

Helal Uddin
Section Officer
Vice Chancellor's Secretariat

Siam is a student of Public Administration at Bangladesh University of Professionals (BUP), pursuing his Master's with a passion for research and community development. His academic brilliance had already earned him a reputation among teachers and peers. Siam's dedication wasn't just limited to books; he was driven by a desire to make a difference. His current project involved studying the plight of people migrating to Dhaka from disaster-prone areas, displaced by floods and cyclones, struggling to rebuild their lives in the city's slums.

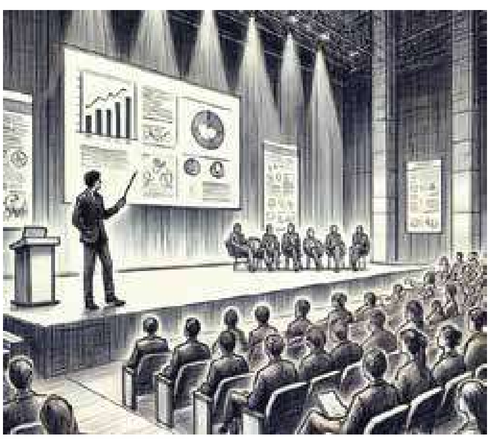

One day, while presenting his research findings at a prestigious conference in Bijoy Auditorium, Siam caught the attention of someone special; Shaila, a third-year student of Development Studies. Shaila had always been passionate about grassroots development, but it was Siam's compelling presentation, filled with empathy and insights, that truly captured her interest. She admired his ability to connect research with real-world impact, and after the session, she gathered the courage to introduce herself.

"Your presentation was truly inspiring," Shaila said, her eyes reflecting genuine admiration.

Siam, humble as always, smiled. "Thank you, Shaila. I'm glad you found it interesting. It's a tough topic, and someone needs to highlight these issues."

From that moment, their connection deepened. What started as intellectual discussions over coffee quickly blossomed into something more. Shaila was charmed not just by Siam's intellect but also by his passion for social change. And for Siam, Shaila's caring nature and keen interest in development works made her the perfect companion.

Their bond grew stronger, and soon, they found themselves working together on a project idea. They wanted to implement a sustainable development project in a flood-affected village, focusing on livelihood recovery for the displaced families. After months of drafting a proposal and endless nights of discussions, their hard work paid off when an international NGO granted their funding.

"I can't believe we're actually going to do this," Shaila said excitedly, holding the grant approval letter in her hands.

Siam smiled, his eyes full of warmth. "We're going to make a real difference, Shaila. Together."

The village they chose was remote, a small community that had been devastated by frequent flooding. The project was aimed at providing sustainable agricultural tools and setting up small-scale businesses to help the villagers regain economic stability. With the funding secured, they both went to the village, filled with hope and determination.

However, their idealistic vision soon met with an unexpected challenge. The local political leader, who had his interests in controlling resources and benefitting from relief funds, didn’t take kindly to outsiders stepping into his territory. He subtly blocked their every move, creating bureaucratic delays and inciting distrust among the villagers.

"We’re doing this for them, why don’t they understand?" Shaila asked one evening, frustrated as they sat in their temporary shelter, looking over the village they so desperately wanted to help.

"It’s politics," Siam replied, equally disheartened. "He is seeing us as a threat to his control. But we can’t let this stop us."

Just when things seemed like they couldn't get worse, Shaila received a call from her father. He had learned about the political tension and wasn’t pleased.

"Shaila, come home immediately," her father’s voice was stern over the phone. "I don’t want you involved in this anymore. And I don’t want you seeing with that boy, Siam."

"But, Abbu, you don’t understand—"
"Enough, Shaila! I’ve made up my mind. Come home, now!"

Reluctantly, Shaila left the village, her heart heavy with disappointment. Her father had always been protective, and while he loved her deeply, he didn’t trust Siam. In his eyes, Siam was an idealistic dreamer, someone who couldn’t provide a stable future for his daughter.

Siam, left alone, was devastated. Not only had he lost Shaila, but the project he had worked so hard on was also at a standstill. Sitting in the village, staring at the setting sun, he wondered if he should give up.

But fate had different plans.

One afternoon, while Siam was contemplating his next move, the Upazila Nirbahi Officer (UNO) arrived unexpectedly. To Siam’s surprise, the UNO was none other than his senior from Dhaka University, who had heard about the project and the political obstacles.

"Siam, you’re not alone in this," the UNO said, placing a reassuring hand on his shoulder. "I’ve heard about the political pressure. Let me handle that. You just focus on the project."

With the UNO’s intervention, the local leader’s resistance was mitigated. Slowly, the project gained momentum. The villagers, who had initially been wary, started seeing the benefits of the initiative. Agricultural tools were distributed, and small businesses began to flourish. The community, once on the verge of collapse, found hope again.

As the project neared completion, news of its success spread beyond the village. National newspapers and TV channels picked up the story, highlighting how a group of young researchers had transformed a flood-stricken village into a self-sustaining community.

Siam, once unknown outside academic circles, became a national figure overnight. His story was hailed as an example of how research and practical action could lead to real change. The media attention didn’t go unnoticed by Shaila’s father.

One evening, as Shaila sat at home, her father approached her, a newspaper in hand. On the front page there was a picture of Siam, smiling alongside the villagers.

"Your friend Siam... he's done something remarkable," her father said, his tone softer than usual.

Shaila looked up, unsure of what to say.

"I misjudged him, Shaila. I thought he was just a dreamer. But now I see he's a man of action. If you still care for him, I have no objection."

Tears welled up in Shaila's eyes. She had missed Siam terribly and longed to tell him how proud she was.

The next day, Shaila returned to the village. When she saw Siam standing in front of the community center they had built together, her heart raced.

"Siam!" she called out.

He turned, surprised but overjoyed to see her. Without a word, they embraced, the weight of the past few months melting away in that single moment.

"I'm so proud of you," Shaila whispered, tears of happiness streaming down her face.

"I couldn't have done it without you," Siam replied, his voice full of emotion. "We're a team, Shaila. Always."

With the project successfully completed and their love stronger than ever, Siam and Shaila knew they had overcome not just external challenges but also the doubts and fears that had threatened to keep them apart. Together, they had created something lasting, not just for the villagers, but for themselves as well.

And as they looked toward the future, hand in hand, they knew that nothing could stand in their way.

The Unbreakable Hand

Mohammad Fahim Faysal
Student
Department of English

In the lively city of Budapest, Hungary, back in 1910, a child was born. He'd later become a symbol of strength and grit. His name? Károly Takács. His story—going from soldier to double Olympic champ—is so much more than just sports. It inspires with a strong message about hope and determination.

Károly showed from an early age that he had a knack for focus and discipline. These traits helped him join the Hungarian Army. He quickly stood out as one of the best pistol shooters in the country with his sharp mind and calm hand. By the late 1930s, he was already a national champ, and people were excited to see him shine at the 1940 Tokyo Olympics. But then, life threw a curveball.

In 1938, during a routine drill, a grenade exploded in Károly's right hand—the hand that had earned him so much praise. In that moment, it felt like his dreams of Olympic success were shattered. Most folks would have given up, but Károly Takács? He was different.

While recovering in silence, he made a choice—a choice that shaped his future. He decided that he wouldn't just keep shooting; he'd become the best! Even though that meant learning to shoot with his left hand—a hand that had never before touched a pistol. For months, he practiced secretly, keeping his struggle hidden from everyone. Day after day, he built up the strength and control he had lost with his right hand. There were no promises of winning, but his resolve was rock-solid.

In 1939—just one year later—Károly re-emerged at the Hungarian National Championships. Folks were shocked when he didn't just show up; he won it all using his left hand! That victory wasn't only about skill; it was proof of an unbreakable spirit.

As World War II swept through Europe, the Olympics was delayed yet again—pushing Károly's dreams further away. However, when the Games kicked off in London in 1948, Károly Takács was ready at the age of 38. With nerves of steel and unmatched bravery, he took on the world's top shooters in rapid-fire pistol event. In an amazing display of focus and precision, Károly took home the gold medal—becoming the first to win an Olympic title with their non-dominant hand.

People were blown away when Károly did it again four years later at the Helsinki Olympics in 1952, snagging another gold medal. By then, his journey was legendary—a true testament to what human spirit can do when faced with tough times.

Károly Takács' life wasn't marked by the loss of one hand but by the strength of the one that remained—steady and guided by an unyielding will. He taught us that obstacles too, can have the chances to tap into our real potential. Through everything, Károly created a legacy way bigger than just medals—a legacy filled with hope, bravery and belief that anything is possible if you try hard enough.

The tale of Károly Takács reminds us all: Life's bumps—no matter how rough—aren't endings but chances for new beginnings. We pen those chapters with our own two hands—whichever one we choose to use!

Source : YouTube

Fueling Innovation: Why Universities Like BUP Should Encourage Student Involvement

Fyruz Yazdani Shukria
Student
Department of Disaster Management and Resilience

Research is the cornerstone of academic progress and societal development. In the context of higher education, research serves as a critical tool for innovation, problem-solving, and knowledge expansion. Universities around the world, including those in Bangladesh, are increasingly recognizing the importance of promoting research, particularly among students.

In this regard, the Bangladesh University of Professionals (BUP) stands out for its efforts to encourage students participation in research, aligning with its mission to foster professional and academic excellence.

What is Research and Why is it Important?
Research is defined as the methodical investigation into a specific area of study to uncover new information, develop theories, or solve practical issues. Its significance extends across all sectors, contributing to advancements in technology, healthcare, social sciences, and more.

1. **Knowledge Creation :** Research enriches academic environment by expanding existing knowledge, filling gaps, and offering new perspectives.

2. **Problem-Solving :** From addressing societal challenges like climate change to advancing medical treatments, research provides the foundation for creating effective solutions.

3. **Innovation:** Major technological advancements, such as AI, biotechnology, and renewable energy, are the direct results of rigorous research efforts.

4. **Informed Decisions :** Governments, businesses, and international organizations rely heavily on research to make data-driven decisions that influence policies and practices.

5. **Skill Development :** Engaging in research fosters critical thinking, analytical skills, and intellectual curiosity, which are crucial for personal and professional growth.

Why Universities Should Promote Research Among Students
Universities play a pivotal role in nurturing the next generation of researchers, and encouraging student involvement in research is essential for several reasons:

1. **Deepens Understanding of Academic Disciplines :** Research allows students to dive deeper into their fields of study, translating classroom knowledge into practical insights.

2. **Fosters Innovation and Creativity :** Universities that promote research cultivate environments where students can explore innovative ideas and develop creative solutions to real-world problems.

3. **Enhances Career Prospects :** Students who participate in research, develops valuable skills that are highly sought after in the job market. Whether in academia, industry, or in the public sector, research experience boosts employability.

4. **Addresses National and Global Challenges :** By encouraging research, universities empower students to contribute to solving pressing issues like poverty, health crises, and environmental degradation.

BUP's Commitment to Research

The Bangladesh University of Professionals (BUP), known for its focus on professional education, has positioned research as a fundamental part of its academic framework.

BUP Research Centre (BRC) was established on 1st August 2023 to promote a research-driven environment at Bangladesh University of Professionals (BUP). It aims to enhance research, innovation, and consultancy opportunities for BUP faculty and affiliated institutions. BRC also invites experts from diverse fields to engage in consultancy and faculty research.

Motto : "Inspiring Innovation for Advancing Knowledge."

Vision : To become a leading research hub in Bangladesh.

Mission : To manage UGC-funded research, conduct consultancy, and undertake BUP-funded innovation projects.

Roles of BRC :

1. **Research Administrator :** Manages UGC-funded research at BUP.
2. **Consultancy Organization :** Builds relationships with research organizations, government, and international entities. Offers services like laboratory support, forensic testing, and more.
3. **Independent Research Entity :** Oversees BUP-funded projects and evaluates research proposals from affiliated institutions.

Faculty Research : BRC administers UGC-funded faculty research projects. Proposals are evaluated for originality, impact, and feasibility through a Project Evaluation Committee (PEC), which approves final reports.

Independent Research/Innovation : BRC handles BUP-funded independent research/innovation projects, assessing proposals from various academic disciplines for merit through the PEC.

Consultancy Services : BRC forms project teams for consultancy projects in areas such as:

1. Business, population, and development studies
2. Security, public health, and gender research
3. Cybersecurity and Industrial Research
4. Services offered including surveys, feasibility studies, market assessments, economic analysis, software testing, and environmental impact assessments.

(Ref: https://www.bup.edu.bd/office/office_details/40)

In an era where research is a key to unlocking future possibilities, universities like BUP are setting a precedent for student engagement. By fostering a strong research culture, BUP is not only ensuring academic excellence but also preparing students to be leaders in their respective fields and contributors to national development. As Bangladesh continues to evolve in a globalized world, universities must take the lead in encouraging research among students. Institutions like BUP are demonstrating the significant role research plays in education, innovation, and societal progress. By equipping students with the tools and opportunities to engage in research, universities are empowering the next generation to solve the complex challenges of tomorrow.

A Rather Odd Fear

Tasneem Azim
Student
Department of Economics

It's such a small word, but it holds you in a vice-like grip at any point, at any experience, at any moment.

Some might have a fear of heights if said in a single word: acrophobia. Some may have a fear of sharp objects, called aichmophobia. Some may be afraid of the idea of marriage and love at the same time. These two are called respectively gamophobia and philophobia. Although the latter two don't, to some degree, need experience, at least that's what I think. You see the tangible effects and the desire to avoid intangible sentiments among the people who saw the end of love burned brighter than ember and marriage, which itself is a promise of harmony and goodwill among the pair tied as if a red ribbon has solidified so.

If I were to speak about the number of fears in the world, it might not end. But this writing has to end at some point, and this is the beginning of my end to this piece.

My fear is bizarre, as the person who might be reading this may think because, I'm sure nobody would think an animal that is docile and cheerful yet stern at proper moments would be a source of fear. This is why the writing is named a rather odd fear.

I have a fear of dogs.

The four-legged animal can't stop people from ruffling their fur, feeding a few handfuls of food, and coddling them to their heart's content. Be it one, on a large or any road or be it in someone else's disposition.

I have had this fear since I was thirteen. A raw age, where children don't comprehend the larger fears, or fear a lot of things quite easily. I, of course, fall into the latter category.

I have always been a child whose feathers are easily ruffled. And one winter evening, a dog decided to do it, when you think only humans, insects, or other random things scare someone enough.

I was in my world with a badminton bat in hand (yes, I loved badminton and still enjoy watching the game) and a guard dog to watch over the place where I lived. It was moving in my hand as I walked towards the badminton court on my merry feet, not fearful of the animal.

When I got a bit further, the dog barked. I stopped in my tracks and saw it with fearful eyes because the danger was eyeing me back. It started running, so I ran briskly, forgetting I had the evening to spend playing. While I was almost at the edge of that path, the dog stopped by itself, and the bat slipped from my hand to the ground, my lungs pulling the chilly air in as two women saw me and my encounter with it.

They asked if I was alright, and I assured them I was left unscathed. I gazed back and saw the dog almost viewing me back with a blind rage. I found myself leaving the spot as fast as possible.

I took the longer path to the court, and I couldn't bring myself to play that evening.

Ever since, even the sight, smell, barking, or anything else that indicates the breed causes my mind to alarm itself as if the crimson and azure siren is dissonant in my ears, and I find myself turning around and avoiding them like a plague.

I get ridiculed a lot. By a lot, I mean it. Being scared of an animal that means no harm. I wonder if they decided to overlook the fact that they are capable of doing so. I don't understand their understanding or their reasoning for loving dogs. I don't think I ever will.

I've been told to never be fearful of them, to not get as rigid as a stone in their presence lurking nearby. To not let them understand I am intimidated by an animal two sizes smaller than I am, or even one if the breed is taller. My only take away from their talk is that they were never in the face of danger for once in their lives. They walk past it like it isn't there. But what they don't understand is that I am incapable of doing so. Dogs scare me to no end, a pet or a stray.

Regardless of anything, I don't think I see myself being in peaceful co-existence with the four- legged animal anytime soon.

The Art of Saving: A Path to Financial Freedom

Atiya Sultana Asha
Student
Department of International Relations

We all are acquainted with the word "Savings". It is a portion of income that is not spent and set aside for future uses. Normally savings are done to meet long or short-term financial goals. Savings may commonly be earmarked for emergencies. The art of saving is not about depriving yourself but about shaping your financial future with creativity and discipline.

From homemakers to students to office employees every adult who is earning something should save something for the near future. So that in times of need they don't have to ask others for money. Especially it goes for students who have part-time jobs. They usually earn a little money as most of them have no permanent income source. Also, they have the tendency to spend all of their income as soon as possible after getting their salary. As a result, they have to spend the whole months borrowing from others, and the cycle goes on. If the person experiences an emergency, there is often not enough money saved up to live on and they may risk falling into debt or bankruptcy. But a little calculation and controlling the habit of spending money extravagantly could save them in the long run. Here, we can use the 50/30/20 rule, a popular budgeting strategy.

50% of your income goes to needs (rent, groceries, utilities).
30% goes to wants (eating out, entertainment, occasional shopping).
20% goes directly into savings or paying off debt.

If we consider it as a palette, some go toward the essentials of your "blues" and "greens", while others bring in the fun and excitement of your "reds" and "yellows." But remember, a balanced palette creates the most beautiful painting. Overspending on wants means using too much of one color, which can throw off the entire piece.

Why Saving Money is an Art?
It can seem impossible to save money in a society where there are always opportunities to spend money on flash discounts, social media marketing, next-day delivery, etc. However, we can see saving as creating a stunning work of art. Just like how artists plan out their creations with small, intentional moves, your financial decisions today will build the foundation for your future. Saving is both a science and an art. The science part is simple: earn, save, and invest. The art, though, lies in how you design a strategy that fits your lifestyle, goals, and personality. That’s where saving becomes personal and creative.

Setting a Vision for Financial Masterpiece
Every artist starts with a vision, and so should we. Our savings plan should begin with our vision for the future. What do you want? A comfortable life? A dream home? The freedom to travel? Savings aren't just numbers, they’re the gateway to achieving our dreams. Set the goal as: Short-term goals could include an emergency fund or a new gadget. Long-term goals might be saving for a house, retirement, or starting your own business.

Just as an artist plans a painting before picking up a brush, knowing exactly where you want to focus your efforts when it comes to conserving money is provided by having defined goals.

The Power of Small, Consistent Brushstrokes
Every masterpiece is built stroke by stroke, and saving works the same way. You don't need to paint the entire canvas in one go. Instead, focus on small, consistent actions that add up over time.

Start small : If you're new to saving, don't stress about putting away large chunks of money at once. Begin with what you can, whether it's 100 taka or 1000 taka, and build on it. The key is to save regularly.

Automate your savings : The easiest way to make saving a habit is to automate it. Set up automatic transfers to a savings account as soon as your paycheck hits. You won't miss what you never see, and your savings will grow without effort. Just like an artist returns to their work consistently, you need to keep adding those small contributions.

Reducing Financial Chaos : You're creating something beautiful, but clutter gets in the way. The same goes for your finances. Cutting unnecessary expenses will not only boost your savings but will also make your life simpler.

Observe your spending : Look at your budget and identify where your money is going. Are you paying for subscriptions you don't use? How much are you spending on daily coffee runs or eating out? These small expenses add up quickly, and trimming them down can free up extra cash for savings.

Say goodbye to impulse buying : Online shopping has made it easier than ever to buy things with just a click. Train yourself to wait for 7 days or at least 24 hours before making non-essential purchases. Often, the urge to buy will fade, leaving you with more money in your savings.

Investment
The equation involves more than just saving. You'll need to incorporate "investing" into your work to fully grasp the art of saving. Investing helps by allowing your money to grow and compound over time. Consider investing as a way to add dimension to your financial portrait. Your flat savings will become a well-rounded financial masterpiece with time as those investments gain depth.

Celebrate Your Wins
An artist knows when to step back, admire their progress, and celebrate milestones. In your savings journey, it's important to do the same. Whether you've saved your first 10 thousand taka or paid off a significant chunk of debt, take a moment to appreciate how far you've come. Reward yourself for sticking to your goals. Use those small rewards as motivation to keep moving forward without derailing your progress.

The art of saving is a slow, steady process, but one that rewards patience and consistency. It's not about quick wins or deprivation; it's about shaping your future with intention. With a clear vision, the right tools, and the discipline to make small, consistent steps, you can transform your financial canvas into a masterpiece of stability and freedom. Remember "A penny saved is a penny earned."

Reference
https://innovation-entrepreneurship.springeropen.com/articles/10.1186/s13731-020-00140-6
https://www.econlib.org/library/Enc/Saving.html

I Hate Rainy Days

Saleh Muhammad Musa
Student
Department of Business Administration in Management Studies

Can you hear the sound of rain? The sky is gloomy and dark, and it has been raining since morning. Rakib sits by the window, his fingers gripping the cold metal of the grill. Occasionally, he extends his hand outside, letting a few raindrops fall into his palm. Despite the soothing rain, a subtle unease grows in his heart. Earlier today, he had another fight with his brother, Rifat, over something trivial.

Rakib is in the seventh grade, and like most boys his age, he spends his free time playing and drawing. Yet, a significant portion of his day is spent fighting with Rifat. Rakib doesn't like his brother much and thinks he is immature. Rifat, five years older, has just started high school, but he still acts like a child. He often destroys Rakib's things, and Rakib finds it hard to get along with him.

One time, Rakib had carefully saved 2,000 taka in a small bank, only to find it empty one day. Rifat had taken all the money and wasted it on something. It's not just the money Rifat constantly borrows Rakib's belongings. Rakib had bought new coloured pencils and pens for a school project, but Rifat took them without asking. Even worse, Rifat brings his friends over to play in the house, invading Rakib's space and making him feel uncomfortable.

The brothers share a room, and Rakib hates it. Rifat is disorganized, throwing things everywhere, which often earns them both a scolding from their mother. Rakib tries to keep his things tidy, but it's a losing battle with Rifat around.

Despite everything, Rifat is well-liked at school. He's an athletic, plays football, cricket, and other sports, and he's involved in voluntary work too. Everyone admires him, but they don't know the chaos he brings into Rakib's daily life.

Today, they fought over something small again. Rifat wanted to take the national flag to a protest that had been ongoing for several days. Rakib didn't want to give it to him, fearing Rifat might lose it. The argument escalated, and Rakib, unable to overpower his stronger, more athletic brother, lost the fight. Before leaving, Rifat told Rakib he was going to the protest and asked him to pray for his safety, and when he came home, he would play with him. But in his anger, Rakib lashed out.

"Don't come back," Rakib spat. "Just die out there. You'll be left on the street with a bullet wound. Don't bother coming home."

The words shocked even Rakib. He didn't mean them; he was just caught up in the moment. Now, sitting by the window, he feels guilty. Despite their constant fights, Rakib idolizes his brother. He wants to be like Rifat as an athletic, popular, and good at everything. Deep down, Rakib loves him more than anything.

Rakib is alone at home now. His mother and sister have gone outside some time ago, and his father is at work. But when his father, mother, and sister return at the same time, something feels off. They seem tense, and Rakib notices a large crowd gathering downstairs. It's raining lightly, yet so, many people are outside. Rakib feels a knot tighten in his stomach.

His mother is crying, tears streaming down her face. His sister is also in tears, and his father, who has just returned from work, is on the phone, his voice strained. The atmosphere is heavy with dread.

Rakib asks his mother what's happening, and why so many people are gathered outside, but she doesn't answer. She just cries quietly, her voice barely a whisper. His sister and father are equally silent.

Ignoring their pleas for him to stay inside, Rakib rushes downstairs. He pushes through the crowd, trying to understand what's going on. When he reaches out to the ambulance, his heart nearly stops. Rifat is lying inside, motionless, a blood-stained flag draped over his still body.

"Bhaiya, what happened to you? Why are you lying inside? Are you sick? Wake up! Please, open your eyes! I'll forgive you for everything for the flag, the money, everything! Just wake up!... sniff…I love you, Bhaiya, please!"

"Bhaiya, O bhaiya! Open your eyes! I will not be angry about the flag! Just open your eyes and wake up , please; in fact, I will give you everything I have. I will not be angry for anything. I will not ask you… sniff... Ask you to organise your stuff. I will do all those things by myself. Just for one time. Please open your eyes. I love you. Bhaiya…sniff… please… Please just open your eyes one time please."

Rakib's voice trembles as he pleads, but Rifat doesn't move. He lies there, as still as he always does when they sleep side by side.

Rifat had promised Rakib he would play with him when he got back, but that promise would never be fulfilled. The protest had turned violent, and many like Rifat had died. Their sacrifice, however, wasn't in vain. The dictator fled the country, and with that, independence was won. But for Rakib, the victory feels hollow. The price was too high. Now, every time when it rains, Rakib is reminded of his brother so he has come to hate the rainy days.

Love's Paradox: Finding Peace in a World of Suffering

Mst. Fatema Binta Alam Jim
Student
Department of Economics

What is your greatest sin?

"My life" is my only sin that cannot be recovered in my lifetime.

You are being harsh and pessimistic here. Is not "life" a gift for you? "Life" is a chance where you are only the creator of choice.

The word "choice" you are using and "Creator" is only because you want to give yourself comfort.

Why?

"Do you really have a choice? Do you believe it?" I know you are aware of it still, but I am telling you not to console yourself from the perspective of your God, your creator, who doesn't care about the choice, "whether you want to come or not to this hell of earth."

No, God gives us life to give us a chance to know ourselves.

But I didn't want that chance. I don't have any intention to live in this hell. I don't find any interest in what to do with life. I am done with it. If God had given me a choice, I would not be there and my God wants me to live in this hell yet not have any option to escape it. Death is the only choice I would make. But your God prohibits to escape this beautiful hell. I was giving myself the highest pain for just the life that I never wanted to.

Why are you so pissed off with yourself? What do you want from your life?

I have already answered. Death is the only peace right now; give me freedom, but your God never wants anyone to escape this game as he is the only creator of this game and finding peace to see me in pain.

God loves us.

Then why is He not gifting me death?

He loves you. He knows what you don't know. Better time is coming. Time will lead you to know the intention of giving you "life". You are born to find him. Your ambition is to see Him; with that, your life will be meaningful. Time heals everything. Please don't stop searching for the truth of your life. It is the only path to life, peace, and heaven on earth.

If God loves us, then why that much hate, and negativity on this earth? He created us with all of this hate. Here, I am trying to escape this life to find a better place so that no one is part of my rage.

You can help them by being kind to them though your situation is not in your favour. You are in trouble. Here comes the choice. If you choose yourself, the result may not be satisfying for you. If you choose others over, you can find happiness in them.

Your God doesn't love me. If He does, I get what I want and I work for it.

He is creating you in your best version. Hard times, heartbreak, frustration, confusion- everything will lead you to your best version. God wants this.

Oh, maybe God asked you about your choice: do you want to come to this earth or not? What if He asked you, and you told Him yes, and now this memory has faded away like the memory in your mother's womb? Now you are the creator of your own choice?

I didn't think of that.

You think about another way, you are the child of nature. So, you have every aspect of nature within you, like storms, sunshine, rainbows, and winter, and you are living in this nature by choosing your path.

That's impressive. Living is the way to "live" in this nature. "Not to live the life is the greatest sin', I guess.

Dystopian Dream

Nashita Shahid
Student
Department of Environmental Science

Mister P. *americana* is living a good life. He has found his humble abode in the garbage chute of an old high-rise apartment. He found an old rag to relax on after a long day of exploring drains and munching on papers, and an old phone to keep himself updated on cockroach affairs. It may not be much, but Mister P. *americana* is happy.

It is currently nighttime. Humans are returning home, and the cockroaches too are leaving home. With no humans with their aerosols in the way, the cockroaches can happily forage for their dinner from rotten leftovers, discarded papers, or dirty rags. Everything is valuable in the cockroach world. Mister P. *americana,* however, remains lain on his rug as the old phone broadcasts the late-night talk show through the Central Cockroach National News channel.

"Good evening, cockroaches! We're here once again to liven up your lazy night with heated debate sessions with the greatest minds!" The host rubs his forelegs cheerily. "We are pleased to announce that tonight's guest is the stealthiest, most resilient of them all, the one who has outlasted generations with his adaptability, Mister *M. rhinoceros,* the wise leader of the Australian community! The wise old cockroach will be sharing his valuable insights on today's hot topic: Are humans a threat or an ally?"

"Thank you to the Cockroach National News for having this old roach on the show tonight. I know a bit about inter-species interactions, as I come from a place shared by many. To my audience, this old roach may not have much knowledge or experience with humans, and I can honestly say that your young ones have had more encounters with those monstrous humans than I ever did." He pauses to adjust his rich maroon-red chitinous cover. "However, living away from those monsters and observing them from afar has led me to discover something revolutionary. Those humans might have been our greatest allies all along."

Murmurs spread through the audience like wildfire at the wise old cockroach's claim. Cockroaches have always been helpless—small, defenseless, chased by avians and felines until they were forced into hiding, living off the waste. Only a few communities have had the privilege of enjoying fresh fruits and vegetation. Then came humans, those gigantic creatures who flung sandals or sprayed poison at the poor cockroaches who only wanted one meal a day. After witnessing such horrors, the wise cockroach's statement felt like he was mocking the cockroach community.

"I hate to interrupt you, Mister *M. rhinoceros,* but I must ask, have you truly witnessed the horrors humans unleash on our kind? Could this not be a propaganda, spread by bored felines to lure us out of our hidings, only to fall victim to their paws?"

The wise cockroach nods his little head, a smile on his face. “I have witnessed the horrors, and I have basked in the blessings. I’ll share my reasons in a moment. I may be mistaken, but I believe those humans will be the soldiers who will bring forth the era of cockroaches.”

Some gasp, unable to believe their cerci. Could it be possible to witness the golden era of cockroaches all over again? Others groan, their hardened instincts rejecting the words of the leader of the oldest community. No matter how much he has seen, he hasn’t experienced what they have in the narrow drains and foul drawers of humans.

“I come from a place shared by many, many beings,” the wise cockroach continues. “But something miraculous has been happening lately. The larger beings are beginning to disappear, especially our mortal enemies: the birds. Without those flying demons hunting us down, we crawlers can forage for food more freely. We now eat the fresh fruits off the trees, not just the scraps left on the ground.”

“That is wonderful to hear, Mister *M. rhinoceros*. I have one question, however.” The host interrupts. “The forest dwellers may benefit from human activities. However, the situation is not at all colourful for the town dwellers. We walk down the drains with our hearts in our mouths, not knowing when we might encounter a gigantic human and their lethal weapon: the aerosol.”

“Survival is never easy, my friend. May I ask, have the town dwellers ever faced a food crisis?” When no one responds, he takes the silence as agreement. “Wasted food, papers, clothes, while these are not the healthiest, there is always something to nourish the town dwellers. Why? Because humans produce, produce, and produce. With no one to consume it all, it trickles down the food chain to us. Will you not acknowledge the recent boom in your population? Would that even be possible without those kind humans and their greed?”

“Well… I certainly can’t disagree with that.” The host glances at the audience, who now seem more curious than agitated. “Fine, maybe humans aren’t entirely bad. Still, don’t you think calling them the soldiers of the era of cockroaches is a bit… flimsy?”

The wise cockroach shakes his head. “There is this thing called ‘global warming’ that’s stirring fear among the humans. They believe that the weather will soon grow warmer, causing the disappearance of lands underwater and more of the larger beings will disappear. But do you know who will thrive in the warmer, more humid climate? The cockroaches. With the bigger beings gone, we shall dominate the planet once more!”

Mister P. *americana* turns the television off. “Whatever. I won’t be living that long anyway. Why should I care?”

Maybe Mister P. *americana* isn’t so different from humans after all.

The Sweet Strawberry Boy

Azra Mahjabin Nirjhor
Student
Department of English

Love comes with melancholy, the melancholy of loss and grief, the unquenchable longing for warmth. The first few weeks are like a sweet daydream. Affection and longing engulf you and you can see, hear, and smell no one else but him, the boy you're falling in love with. The boy. The one. The one you keep searching for in the crowd. The one you cannot help but think about and drown yourself in a sweet reverie. The sweetness of the time keeps you so intoxicated that you ignore the threats. The neglect and the betrayal start to creep up when you're looking at nothing but the sweet, sweet face of the boy, the one. The deception comes slowly, like a misplaced pair of socks. Well, it can happen to anyone. It's not intentional. But the socks keep disappearing. Was there a thief in the house? Is it the mischievous neighbourhood cat? Of course, not the sweet strawberry boy. But the inkling of him being the one behind the theft slowly starts to sneak up on you. It keeps you up at night. But then you look at the sweet, sweet face of the boy. You think, he can never betray you like that. Can he? Can he not? Maybe he found a better pair of legs for those fuzzy socks you love. Perhaps a better pair of feet, worth keeping warm.

Can he do that to you? Of course not. It's the neighbourhood cat; you're sure of it? How can you be doubtful of him? The one who made you feel the warmth of a gentle, sunny morning after a long season of cold, dreadful winter. Then you start to realize it's not just the socks that are going missing; you're missing the boxes of glitter you so tenderly stored in the safest place of the house. Then your favourite colour. The house is empty of red. You get anxious. You go from room to room to find any trace of red. There is no red anywhere in the house. It has been replaced with grey. Everything is grey. The sweet strawberry boy looks at you with empty eyes. You realize the sweet boy, the one, has taken all your red and given it to someone else. You take a knife and slash your heart open. Surely, he cannot take the red within you. You pull out a grey ball of cotton yarn. Yes, you recognize it. The yarn you picked so tenderly and poured so much affection into to knit a blanket for your sweet boy to keep him warm in the cruel winter. It is tangled up now. You cannot break free from the yarn wrapped around your throat. The cut from the knife bleeds with a greyish hue. How is your sweet strawberry boy capable of such cruelty? You think of yourself, bleeding on the ground as you watch your sweet boy walk away, hand in hand with the girl next door.

Yellow Cabinets

Lum Yea Hossain Ankona
Student
Department of Business Administration in Management Studies

You’re carrying an emptied cup of coffee to the kitchen, the cool weight of it steady in your hand. But then, in an instant, it slips away from your grasp, and the sharp sound of shattering porcelain cuts the air. Can you have an out-of-body experience in such a mundane accident? I don’t know about you, but I experience these fleeting outer-body moments more often than I’d like to admit. There’s something about the simplicity of these ordinary mishaps that pulls me out of myself and sends me drifting to places far away. Mostly, I find myself in open fields of green or nestled inside a cozy house with yellow cabinets and a garden overflowing with vegetables. Other times, I’m in a library where the shelves climb high to the ceiling, the books so colourful they light the room brighter than any lamp.

These visions are so vivid, so tangible, that they often feel more real than the world I’m standing in. And I find myself wanting to be there, in those dreams, more than I want to be here standing over broken China in my kitchen. Over time, I’ve begun to wonder why my mind is so often slips away. Is it just procrastination in disguise? Or is there something deeper, something more quietly melancholic about this need to escape? Perhaps my daydreams already give you the context for how big of a reader I am. So, I resorted to my paper on Google. I’ve spent hours sifting through pages, searching for answers to this strange phenomenon. And the theories I’ve found are compelling.

First, there’s ADHD, an attention deficit disorder. But I’ve never been diagnosed with it, so I set that aside. Then, there’s habitual procrastination. But here’s the thing: I’ve never missed a deadline in my life. And then, there’s the third possibility, the one that struck me the hardest. It’s a theory that suggests we carry a deep, long-term frustration with the life we’ve been given. That this yearning to escape is born from an inner discontent, seeded in childhood, and nurtured over the years.

This is what we will delve into. “From the moment we are born, we start to die”. Life is this linear process, a fragile thread weaving through joy, sorrow, ecstasy, and loneliness. And yet, in the end, we all reach the same destination. Oblivion. It’s easy to get stuck on this, to fall into the trap of thinking, "If everything fades into nothing, what’s the point?" But here’s, where I step off the path of nihilism. We spend so much time fretting over the big things - jobs, relationships, rent, which cat you like the most. But what about the small moments that catch us off guard? The cappuccino that spills across your shirt, the love letter you lost during a move, the empty wallet that fell from your pocket on a trip. Do these little misfortunes mean nothing because they pale in comparison to life’s greater tragedies?

My whole life, these little sad appetizers summed up to an unfathomable despair. It wasn't the threat of bankruptcy that left me feeling crushed; it was a torn shoe in the middle of the road. Losing my favourite book pained me more than my distant father. Even, a movie made me cry harder than my grandmother's funeral. My point is, I lose myself in fantasies so often because that's the only way I know how to evade this guilt; this constant guilt of how little things have always mattered more to me than devastating grieves. In those dreams, in my house with yellow cabinets, my China teacups never broke. Even if it did, I didn't have to cry over a tiny cup that slipped out of my hands by mistake.

Beneath the Same Sky

Shurovi Akter
Student
Department of Public Administration

Beneath the same sky, we all stand,
In different lands, on distant sand.
Yet the stars that shine above our heads,
Are shared by all, no matter where we stand.

The sun that rises in the east,
Greets every soul, the greatest and the least.
Its warmth is felt by every heart,
Though miles may keep our worlds apart.
The moon, in all its silent grace,
Reflects on each familiar face.
It knows our dreams, our hopes, our fears,

The joys we've known, the silent tears.
Beneath the same sky, our spirits soar,
Seeking peace, yearning for more.
And though our paths may not align,
The heavens above remind us, we are intertwined.
For in the vastness of this endless blue,
There's a truth that we all hold true:
No matter how far we may seem,

We all share the same human dream.
The sun that rises, day by day,
Reminds us all, we find our way.
Through darkest nights or brightest morn,
Beneath this sky, new strength is born.

The Delusion

Md. Shah Abdul Aziz
Student
Department of Business Administration in Management Studies

I've this delusion,
Where I’m laying on your lap under an olive tree.
I've this delusion,
Where I’m running through the riverside, holding your hand on a moonlit night.
I've this delusion,
Where my mom and daughter both will respond if I shout with 'Maa'.
I've this delusion,
Where my father will finally be proud of me.
I've this delusion, my love.
Where I’ll finally be loved back.
I've this delusion, darling.
Where my sisters are safe, children’s are spontaneous.
I've this delusion, my little.
Where no mother will have to lose their child.
I've this delusion, my dear.
Where my brothers are not at war.
I've this delusion, ma.
Where I’m no longer tensed because of the cruelty of this world.
I've the delusion of a better world.
Where I’ll finally be happy.

The Echoes in “Me”

Sumiya Afrin
Student
Department of Information, Communication and Technology

"O tortured soul, a prisoner of thy mind,
Where shadows dance and demons intertwine."

"A labyrinth of fear, a mind aflame,
Consumed by voices, driven mad by shame."

"Sarah, the gentle one, a heart of gold,
Jack, the angry youth, a story untold."

"And silent watcher, ever still and cold,
A haunting presence, a tale to unfold."

"A puppet pulled, a marionette's plight,
Controlled by forces, shrouded in night."

"A stranger to yourself, a soul forlorn,
Lost in the darkness, where hope is torn."

"A cliff's edge, a precipice of fear,
The voices whisper, 'Jump, my dear.'"

"But a new voice, a whisper soft and low,
'You are stronger; let your spirit grow.'"

"A battle fought, a victory won,
The darkness vanquished, the battle done."

"Yet shadows linger, a haunting sight,
A constant reminder of the darkest night."

"But with each passing day, a hope renewed,
A spirit strengthened, a heart imbued
With courage, strength, and will to fight,
Against the darkness, with all thy might."

Ode to My Motherland, Bangladesh

Nahidul Islam Nayon
Student
Department of Business Administration in AIS

My heart beats with the rhythm of the rivers,
The Padma, the Meghna, the Jamuna flow through my veins,
Your beauty reflected in the endless plains,
Where my soul roams, free of chains.

Your fields of gold sway beneath the sun,
While the Sundarban whispers where the wild rivers run.
From Sylhet's tea gardens to the Chittagong hills,
Your beauty calls me, with a voice that stills.

For you, my motherland, my blood runs deep,
In your soil, my roots will forever keep.
The winds may change, the skies may fall,
But I'll stand by you, answering your call.

In the sweep of the monsoon, your rains I greet,
With each drop, I taste both joy and defeat.
But I will not waver, nor bend in the storm,
For in your shelter, I feel safe and warm.

The rivers carve stories of struggle and pride,
In the lap of your waves, a warrior resides.
I'll give my breath, my soul, my flame,
For your freedom, for your honor, I'll bear your name.

When darkness looms and shadows grow tall,
I will rise for you, no matter the fall.
For my beloved Bangladesh, I am the shield,
In your service, my strength is revealed.

Each ripples a promise, each wave a song,
I have lived for you, and I'll die just as strong.
Your past is my pride, your future my fight,
In your shadow, I burn with eternal light.

With each breath, I pledge, through rise and fall,
Bangladesh, forever I answer your call.

Bloodshed of July

Nahin Rahman Sami
Student
Department of Public Administration

I dare you to see
The bloodstains as you walk down to the road.
Before you disguise yourself in the busy world of yours,
I dare you to stop and feel,
Because it might not heal.
Upsurging, dead bodies were lying on the road.
Dead bodies of those
Who revolted there,
Before the wrong without fear.
Dead bodies
Which they were not until a few days ago.
I dare you to think of
What they left us.
They left us with their fearless dream.
They left us with an unfinished war!
Now, before you go,
I dare you to know
Their bodies were already stiffened
And their eyes didn’t close.

শিক্ষার্থীদের পেশাগত বিকাশে নেটওয়ার্কিংয়ের গুরুত্ব

মেজর সাবির আহমেদ (অব:)
ডেপুটি রেজিস্ট্রার একাডেমিক
একাডেমিক সেকশন, রেজিস্ট্রার অফিস

ভূমিকা

বিশ্ববিদ্যালয় জীবন একজন শিক্ষার্থীর জন্য একটি অমূল্য সময়, যেখানে একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি ব্যক্তিগত ও পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ থাকে। এই সময়ে শিক্ষার্থীরা জীবনের নানা দিক সম্পর্কে অবহিত হয় এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারে। তাদের সামাজিক এবং পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য যোগাযোগের দক্ষতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা শুধুমাত্র পাঠ্যসূচি অনুসরণ করে না, বরং বিভিন্ন ইভেন্ট, কর্মশালা এবং সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে তাদের নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি করে। এটি তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ায় এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কীভাবে কার্যকরভাবে যোগাযোগ করতে হয় তা শেখায়। সুতরাং একটি শক্তিশালী পেশাগত নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং সেই সম্পর্কগুলোকে বজায় রাখা শিক্ষার্থীদের পেশাগত উন্নয়নে সহায়তা করে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সময়টিকে উপভোগ করা এবং নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নেটওয়ার্কিংয়ের গুরুত্ব

নেটওয়ার্কিং হল পেশাগত এবং সামাজিক উভয় ক্ষেত্রেই সম্পর্ক তৈরির প্রক্রিয়া। এটি কেবল পেশার উন্নতি নয়, বরং সামাজিক সংযোগের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ। একটি কার্যকর নেটওয়ার্ক শিক্ষার্থীদের মেন্টরশিপ, প্রশিক্ষণ ও নতুন ধারণা গ্রহণে সহায়তা করে। যখন শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রের পেশাজীবীদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করে, তখন তারা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে যা তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করে। নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে চাকরির সুযোগের বিষয়ে সচেতন হতে পারে। পাশাপাশি তারা যখন জানেন যে তাদের পেশাগত নেটওয়ার্কে অভিজ্ঞ পেশাজীবী রয়েছেন, তখন তারা তাদের সমস্যাগুলোর সমাধানে সহায়তা পেতে পারে। একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক ছাত্রজীবনে নানা ধরনের সুযোগ নিয়ে আসে - এটি শুধুমাত্র চাকরির সুযোগ নয়, বরং সৃজনশীল প্রকল্প, ব্যবসায়িক সহযোগিতা এবং নতুন উদ্যোগের ক্ষেত্রেও সহায়ক হয়। অতএব, নেটওয়ার্কিং শিক্ষার্থীদের পেশাগত জীবনে সাফল্যের জন্য একটি অপরিহার্য মাধ্যম।

নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে ক্যারিয়ার গঠনে সুবিধা

নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পেশাগত জীবনে বিভিন্ন সুবিধা পেতে পারে। যেমন–

নতুন কাজের সুযোগ : নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে নতুন চাকরির সুযোগের সন্ধান পাওয়া সহজ হয়। অনেক সময় নেটওয়ার্কের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা চাকরির বিজ্ঞপ্তির আগে থেকেই কাজের সম্ভাবনা সম্পর্কে জানতে পারে।

পেশাগত পরামর্শ এবং মেন্টরশিপ : অভিজ্ঞ পেশাজীবীদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা মেন্টরশিপ পেতে পারে যা তাদের ক্যারিয়ার গঠনে সহায়ক হয়।

দক্ষতা উন্নয়ন : বিভিন্ন পেশাজীবীর সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নতুন দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জন করতে পারে যা তাদের একাডেমিক ও পেশাগত জীবনে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

পেশাগত বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি : পেশাগত নেটওয়ার্ক বিস্তৃত হলে একজন ব্যক্তির পেশাগত বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়, যা ভবিষ্যতের ক্যারিয়ার অগ্রগতিতে সহায়তা করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন সময়ে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার কৌশল

১. সহপাঠীদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন : প্রথম ও সহজ পদক্ষেপ হচ্ছে আপনার সহপাঠীদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা। ক্লাসের মধ্যে দলগত কাজ, অধ্যয়ন গ্রুপ এবং বিভিন্ন প্রকল্পে একসাথে কাজ করার মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন সম্ভব। এই সম্পর্কগুলো ভবিষ্যতে পেশাগত জীবনে সহায়ক হতে পারে।

২. ক্লাব ও সংগঠনে অংশগ্রহণ : বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ক্লাব, সংগঠন ও কমিটিতে যুক্ত হওয়া শিক্ষার্থীদের জন্য নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার একটি দারুণ সুযোগ। এসব ক্লাব ও সংগঠনে কাজ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নেতৃত্বগুণ, দলগত কাজের দক্ষতা ও বিভিন্ন ইভেন্ট আয়োজনের অভিজ্ঞতা লাভ করে, যা তাদের ভবিষ্যতের ক্যারিয়ারে সহায়ক হয়।

৩. সেমিনার ও ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ : বিভিন্ন সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিশেষজ্ঞদের সাথে পরিচিত হতে পারে এবং তাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে পারে। এই ধরনের ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে শিক্ষার্থীরা সরাসরি বিশেষজ্ঞদের সাথে মতবিনিময় করার সুযোগ পায় যা তাদের পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশে সহায়ক হয়।

৪. শিক্ষকদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা : শিক্ষার্থীদের জন্য তাদের শিক্ষকদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকরা কেবল একাডেমিক গাইড হিসেবে নয়, বরং ক্যারিয়ার পরামর্শদাতা হিসেবেও কাজ করতে পারেন। শিক্ষকদের সাথে নিয়মিত মতবিনিময় ও পরামর্শ গ্রহণ শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার পরিকল্পনায় সহায়ক হতে পারে।

৫. ইন্টার্নশিপ এবং স্বেচ্ছাসেবী কাজ : ইন্টার্নশিপ এবং স্বেচ্ছাসেবী কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পেশাগত জগতে প্রবেশ করতে পারে এবং বাস্তব কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। এটি তাদের প্রফেশনাল নেটওয়ার্ক বৃদ্ধিতে সহায়ক।

৬. লিংকডইন ও অন্যান্য প্রফেশনাল নেটওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার : বর্তমান যুগে ডিজিটাল মাধ্যমগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। লিংকডইন বা অন্যান্য প্রফেশনাল নেটওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের প্রোফাইল তৈরি করে বিভিন্ন পেশাজীবী এবং প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারে।

৭. বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাই নেটওয়ার্কের সুবিধা : অ্যালামনাই (পুরনো শিক্ষার্থী) নেটওয়ার্ক একটি শক্তিশালী পেশাগত সংযোগের মাধ্যম হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা সাধারণত বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এবং তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করলে শিক্ষার্থীরা তাদের অভিজ্ঞতা, সুযোগ ও পরামর্শ গ্রহণ করতে পারে।

৮. ক্যাম্পাসে অতিথি বক্তা বা কর্পোরেট লিডারদের সাথে যোগাযোগ : বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ এবং কর্পোরেট লিডারদের আমন্ত্রণ জানানো হয় বক্তৃতা বা কর্মশালায় অংশ নেওয়ার জন্য। এই ইভেন্টগুলোতে অংশগ্রহণ করা শিক্ষার্থীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নেটওয়ার্কিং সুযোগ। বক্তাদের সাথে সরাসরি আলাপ করা বা ইভেন্ট শেষে তাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা শিক্ষার্থীদের জন্য একটি মূল্যবান নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার মাধ্যম হতে পারে।

৯. ক্যাম্পাসের রিসার্চ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ : বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্পে অংশগ্রহণ শিক্ষার্থীদের নেটওয়ার্কিংয়ের একটি বিশেষ সুযোগ তৈরি করে। প্রফেসর, গবেষক এবং অন্যান্য সহপাঠীদের সাথে যৌথভাবে কাজ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা একাডেমিক ক্ষেত্রের প্রফেশনালদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। এ ধরনের গবেষণামূলক কাজ ভবিষ্যতে পেশাগত ও একাডেমিক সুযোগ তৈরি করতে সহায়ক হতে পারে।

১০. ব্যক্তিগত ব্র্যান্ডিং এবং আত্ম-উপস্থাপন দক্ষতা : নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য শুধু অন্যান্যদের সাথে সংযোগ স্থাপন করাই যথেষ্ট নয়, নিজেকে উপস্থাপন করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত ব্র্যান্ডিংয়ের ওপর মনোযোগ দেওয়া উচিত, যেমন তাদের প্রফেশনাল প্রোফাইল তৈরি করা, অনলাইন প্রেজেন্স বৃদ্ধি করা এবং প্রফেশনাল ইমেজ উন্নয়ন করা। এই দক্ষতাগুলো ক্যারিয়ারে স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক তৈরি করতে সহায়তা করে।

উপসংহার

বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং এটি শুধু একটি সময়ের ব্যাপার নয় বরং একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রয়াস। দক্ষতা ও কৌশলের ভিত্তিতে নেটওয়ার্ক তৈরি ও বজায় রাখা শিক্ষার্থীদের পেশাগত জীবনে সাহায্য করে। তাদের একটি মজবুত নেটওয়ার্ক থাকলে তারা শুধুমাত্র কাজের সুযোগই নয়, পেশাগত অভিজ্ঞতা, জ্ঞান এবং সমর্থনও পেয়ে যায়। শিক্ষার্থীদের উচিত এই সুযোগগুলো গ্রহণ করা এবং তাৎক্ষণিকভাবে নেটওয়ার্ক গড়ার চেষ্টা করা। সর্বদা নতুন সম্পর্ক তৈরি ও পুরনো সম্পর্কগুলোকে বজায় রাখার চেষ্টা করা উচিত, কারণ এগুলো ভবিষ্যতে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কার্যকরী হতে পারে। কর্মসংস্থান ও পেশাগত উন্নতির জন্য একাডেমিক কার্যক্রমের পাশাপাশি নেটওয়ার্কিংকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। তাই নেটওয়ার্কিংকে শিক্ষার্থীদের জীবনের একটি অঙ্গীকার হিসেবে গ্রহণ করা উচিত, কারণ এটি তাদের ক্যারিয়ার গঠনে একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করতে সহায়তা করবে।

গবেষণা, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ

ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক
ডিপার্টমেন্ট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স

আমি স্নাতক পাস করেই চলে যাই বিশ্বখ্যাত ইরাসমুস মুন্ডুস (কেউ কেউ একে ইরাসমাস মুন্ডাসও বলে থাকেন) স্কলারশিপ নিয়ে দ্যা নেদ্যারল্যান্ডসে (ওয়াখানিখেন বিশ্ববিদ্যালয়) স্নাতকোত্তর করতে। ইরাসমুস মুন্ডুস হচ্ছে ইউরোপিয়ান কমিশনের ইউরোপে পড়ার জন্য একটা জগৎখ্যাত নতুন স্কলারশিপ প্রোগ্রাম যা অন্যান্য স্কলারশিপ প্রোগ্রামের চেয়ে একটু আলাদা। এই স্কলারশিপ নিয়ে যিনি পড়তে যান, তাকে একাধিক দেশের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যেতে হয়। যাই হোক, আমি দ্যা নেদ্যারল্যান্ডস থেকে সুইডেনের উপসালাতে (এসএলইউ বিশ্ববিদ্যালয়) পড়তে চলে যাই। এখানে ইউরোপ এবং সারা বিশ্বের বিখ্যাত উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি দেখেছি গবেষণার জন্য তাঁরা কী না করছেন! আমরা ভাবি, এই দেশ কেন এত এত উন্নত, এর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সুবিধাগুলো দেখলেই বোঝা যায় কেন তাঁরা এত উন্নত হয়েছেন! একটি দেশের উন্নতির চাবিকাঠি বলা যায় এর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গবেষণা। এক একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক একটা ল্যাবে (যেখানে গবেষণা পরিচালনা হয়, হোক তা যেকোনো ধরনের গবেষণা) কী পরিমাণ এরা খরচ করছেন। একটা একটা গবেষণা কত গুরুত্ব পাচ্ছে। তুচ্ছ তাচ্ছিল্য তো দূরের কথা, কী পরিমাণ বাহবা, সম্মান পাচ্ছেন গবেষকরা। গবেষকরা গবেষণা যেন চালিয়ে যেতে পারেন এর জন্য কত শত উদ্যোগ।

এরপর আমার সৌভাগ্য হয়েছিল এমন একটি দেশে যাওয়ার, যেই দেশ সারা পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তাদের গবেষণা দিয়ে। যে দেশের আপামর জনগণ মনে করেন তাঁদের উন্নতির শিখরে পৌঁছানোর অন্যতম প্রধান বাহক হচ্ছে গবেষণা। যেই দেশ একটি যুদ্ধে বিধ্বস্ত, ধ্বংসস্তূপ থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল, যেই দেশ বারবার দুর্যোগের পর উঠে দাঁড়ায় অন্য যেকোনো দেশের তুলনায় খুবই দ্রুত। হয়ত আপনারা অনেকেই বুঝে গেছেন আমি কোন দেশের কথা বলছি, হ্যাঁ জাপান। জাপান সরকারের মনবুকাগাকুশো স্কলারশিপ নিয়ে আমি চলে যাই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপর উচ্চতর ডিগ্রি নিতে। আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাই, আমি বলব সেই বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সাধারণ মানের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় (জাপানের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে)। আমার পূর্বের বাংলাদেশী সম্মানিত শিক্ষক এখানে পড়তেন বিধায় আমিও এখানে চলে আসি। কিন্তু এই যৎসামান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েও গবেষণার যে হুলস্থুল কর্মকাণ্ড ! আমার এখনও মনে আছে, আমাদের ল্যাবের যে বিশাল ওয়াটার চ্যানেল ছিল, সেখানে আমরা বিশাল ঢেউ উৎপন্ন এবং পরিমাপ করতে পারতাম। জাপানের অন্যান্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ল্যাব থেকে আমাদের ল্যাব ছিল বলা যায় সামান্যই। কিন্তু এই সামান্য ল্যাবেই বিশাল ওয়াটার চ্যানেল ছাড়াও (যেখানে সুনামি, বন্যা অথবা জলোচ্ছ্বাসের ঢেউ উৎপন্ন এবং পরিমাপ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ছিল) ছিল সুপার কম্পিউটার, যা দিয়ে আমরা সিমুলেশন করতে পারতাম। জাপানে প্রতিটা গবেষক, শিক্ষকের আলাদা ল্যাব গ্রুপ থাকত, যেখানে তাঁর ছাত্রছাত্রীরা রাত দিন কাজ করেন, সভা সেমিনার করেন বিভিন্ন গবেষণা নিয়ে। আর এসবের জন্য উনি পেতেন অনেক অনেক গ্রান্ট, যেন উনি গবেষণা অনবরত চালিয়ে যেতে পারেন। আমি অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষকদেরও (যেমন: সোস্যাল সাইন্স) দেখেছি কত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করছেন এবং এর জন্য দেয়া হচ্ছে পর্যাপ্ত সুবিধা।

উপরের দুই উন্নত দেশের উদাহরণ আমরা দেখেছি। এছাড়া বর্তমানে সব থেকে বেশি উচ্চতর ডিগ্রির জন্য শিক্ষার্থীরা ইউএসএ-র প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছেন। আমার বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীদেরই আগ্রহ এই দেশে যাওয়ার। কারণ হিসাবে বলা যায় গবেষণার জন্য অফুরন্ত সুবিধা। অনেক ছাত্রছাত্রীই ওখানে টিচিং অথবা রিসার্চ এসিস্ট্যান্ট হিসেবে যান। আর এর জন্য ওঁনারা যে আর্থিক সুবিধা প্রাপ্ত হন, তা দিয়েই ওঁনাদের ডিগ্রী সম্পন্ন করতে পারেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিশ্বের তাবৎ তাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা হচ্ছে প্রাণ। এর মানে হচ্ছে গবেষণাই বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করছে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে। একটা

বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে জ্ঞানচর্চার আসর। এখানে নতুন পুরাতন সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হবে, এর সমাধান বের করার চেষ্টা হবে। যদি একটা সহজ উদাহরণ দেই– বাংলাদেশে বজ্রপাতের দরুন প্রতিবছর মানুষ মারা যাচ্ছে। বজ্রপাতে মানুষের মৃত্যুর পরিমাণ দিনকে দিন বেড়ে যাওয়ার ফলে ২০১৬ সালে বাংলাদেশ সরকার বজ্রপাতকে দুর্যোগ হিসেবে ঘোষণা করে। এই ঘোষণার ফলে দুর্যোগকে মোকাবেলা করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপের প্রয়োজন দেখা দেয়। উপযুক্ত পদক্ষেপের জন্য গবেষণা আবশ্যিক। আর এই গবেষণা করতে পারে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। বজ্রপাত কেন বেশি হচ্ছে, কোন জায়গায় বেশি হচ্ছে, কোন কারণে মানুষ মারা যাচ্ছে, কোথায় কোথায় ঘাটতির ফলে মানুষের মৃত্যু হচ্ছে, এইগুলো বের করার জন্য গবেষণা করার প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এগুলো খুঁজে বের করবে গবেষণার মাধ্যমে। আর এর প্রয়োগ করবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। এভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অবদান রাখবে দেশের উন্নয়নে। আর বেঁচে থাকবে জ্ঞানচর্চা। আমি যখন জাপানে যাই, এর কিছুদিন আগেই জাপান সম্মুখীন হয়েছিল ২০১১-এর ভয়ংকর সুনামির। ফলে জাপান জুড়ে সুনামি নিয়ে গবেষণা চলছিল। কীভাবে এই সুনামির আঘাত এবং এর ফলে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কমানো যায় তা নিয়ে চলছিল বিভিন্ন আঙ্গিকে গবেষণা। কেউ ড্যাম নিয়ে গবেষণা করছিলেন, কেউ কেউ ন্যাচারাল ব্যারিয়ার নিয়ে গবেষণা করছিলেন, আবার কেউ কেউ সুনামি নিয়ে মানুষের চিন্তা চেতনা ও ব্যবহার বিষয়ে গবেষণা করছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড। এমনই তো হওয়া উচিৎ। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শুধু ক্লাসকেন্দ্রিক না হয়ে, বরং গবেষণাকেন্দ্রিক হবে। ক্লাসে বিভিন্ন বিষয়ের উপর সামগ্রিক এবং বেসিক বিষয়গুলো ছাড়াও নতুন নতুন গবেষণা নিয়ে আলোচনা হবে, যা ছাত্রছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করবে।

আমি ২০২৩ সালে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর গিয়েছিলাম। মালয়েশিয়ার উন্নতির অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে বলা যায় মাহাথির মোহাম্মাদের বিভিন্ন উদ্যোগ। এর ভেতর অন্যতম হচ্ছে মালয়েশিয়াতে গবেষণা বাড়ান। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণার জন্য বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান। এক একজন শিক্ষক অথবা গবেষক যেন গবেষণা করতে পারেন এই জন্য বিভিন্ন রকম ফান্ড, পাবলিকেশন্সের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা ও প্রেরণা প্রদান। আমরা যদি তেল সমৃদ্ধ আরব দেশগুলোর দিকে তাকাই, তাঁরাও কিন্তু গবেষণার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছেন। তাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণার জন্য বিভিন্ন প্রণোদনা দিচ্ছেন। নিজ দেশের গবেষকদের পাশাপাশি, জগৎখ্যাত গবেষকদেরও তারা ডেকে আনছেন বিভিন্ন আকর্ষণীয় সুবিধা প্রদান করে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রাণ ধরে রাখতে হলে, অথবা প্রাণের সঞ্চার করতে হলে গবেষণা করতে হবে। এই গবেষণার জন্য থাকতে হবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কার্যকরী পদক্ষেপ, যে পদক্ষেপ শুধুমাত্র খাতা কলম অথবা মুখে মুখে হলে হবে না, এর উপযুক্ত প্রয়োগ থাকতে হবে। না হলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রাণহীন হয়ে যাবে, আমাদের দুর্দান্ত মেধাবী ছাত্রছাত্রীগুলোর মেধা কাজে লাগবে অন্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে, অন্য দেশের উন্নয়নে। আমি এটাকে খারাপ বলছি না। অন্তত বৈশ্বিক উন্নয়নে কাজে লাগছে। কিন্তু এই উন্নয়ন হতে পারত আমাদেরই কার্যকরী পদক্ষেপের মাধ্যমে। যা কিনা আমাদের এবং বৈশ্বিক উন্নয়নে কাজে লাগতে পারে। যেখানে আমাদের অবদান থাকতে পারে বেশি। যা হতে পারে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রাণের সঞ্চারের মাধ্যমে।

রক্তের ভাষা

তোফায়েল আহমেদ
সহকারী পরিচালক
অফিস অব দি ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স

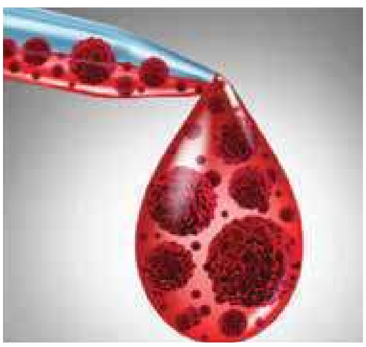

রক্তেরও ভাষা থাকে! কী শুনতে অবাক লাগছে! রক্তের আবার ভাষা হয় কী করে? অবাক হওয়ারই কথা। অবাক হলেও সত্য যে রক্তেরও ভাষা আছে। তবে রক্তের ভাষা আর আমাদের মুখের ভাষা এক নয়। দুইয়ের মধ্যে রয়েছে বিস্তর তফাৎ। রক্তের ভাষাকে বুঝতে হলে আমাদের হতে হবে একটু চিন্তাশীল। আমাদের আয়ত্ত্ব করতে হবে দেহযন্ত্রের প্রাথমিক কিছু জ্ঞান। তবেই বুঝতে পারবো রক্তের ভাষা। বুঝতে পারবো কী অর্থ নিহিত আছে সে ভাষায়? সৃষ্টিকর্তার এক অসীম সম্ভাবনাময় ও শক্তিশালী সৃষ্টি হলো মানুষ, যাকে বলা হয় আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব। সৃষ্টিকর্তা তার সর্বোৎকৃষ্ট বিচক্ষণতা ও সুন্দর সৃষ্টিশীলতার এক অবিস্মরণীয় সমন্বয় ঘটিয়েছেন মানুষের দেহযন্ত্রে। মানুষে মানুষে অসংখ্য ভিন্নতা থাকলেও একটি বিষয়ে মানুষের মধ্যে নিবিড় মিল রয়েছে, আর তা হলো রক্তে (Blood)। এই রক্তের অসংখ্য ভাষার মধ্যে একটি অভিন্ন ভাষা হলো তার বর্ণ। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, ধনী-গরীবের মধ্যে দৈহিক, সামাজিক, আর্থিক ভিন্নতা পরিলক্ষিত হলেও সবার রক্তের বর্ণ কিন্তু লাল। এটি রক্তের দুর্লভ ভাষা। এছাড়া, রক্তের এমন সব ভাষা রয়েছে যে ভাষার উপর আমাদের ন্যূনতম জ্ঞান থাকা আবশ্যক। যদিও অনেকে হয়তো বলবেন এজন্য তো বহু দক্ষ ভাষাবিদ (ডাক্তার) রয়েছেন যারা আমৃত্যু সে ভাষা বোঝার ও জানার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। সেই ভাষাবিদের কাজই হলো রোগাক্রান্ত মানুষকে বিপদের সময় তার রক্তের ভাষা বুঝিয়ে দেওয়া, শান্ত রাখা, অভয় দেওয়া কিংবা তার জাগতিক জীবনের গন্তব্যটুকু নিশ্চিত করা। কিন্তু আমি বলবো এই ভাষাজ্ঞান আমাদের সবার মাঝেও কিছু না কিছু থাকা উচিত যাতে করে মানব শরীরের গতিশীল লাল তরল পদার্থের ভাষা আমরাও বুঝতে পারি। আরো বুঝতে পারি সে ভাষায় আমাদের কী জানাতে চায়। রক্তের ভাষাতেই যেন আমরা দেহের সুস্থ কিংবা অসুস্থ রূপ অনুধাবন করতে পারি। যদিও আমি রক্তের ভাষাবিদ নই, তবে জীববিজ্ঞানের কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকায় রক্তের ভাষাকে বুঝার জন্য চেষ্টা করেছি। আমার সামান্য চেষ্টায় বোধগম্য ভাষাটুকুই আজ পাঠকের সামনে তুলে ধরার ক্ষুদ্র প্রয়াস।

রক্তের পরিচয়

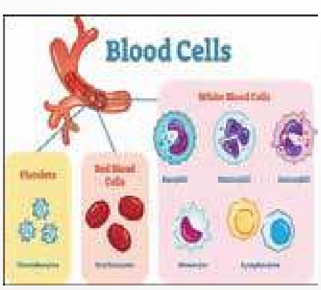

বিজ্ঞানীদের ভাষায় রক্তের পরিচয় না দিয়ে যদি সাধারণ বোধগম্য ভাষায় বলি তবে রক্তের পরিচয় হলো-রক্ত এক ধরনের লাল বর্ণের তরল পদার্থ যার প্রধান কাজ হলো পরিবহন। বিজ্ঞানের ভাষায় রক্তের পরিচয় অনেক বিস্তৃত। বিজ্ঞানের ভাষায় রক্ত হচ্ছে প্লাজমা (রক্তরস) ও প্লাজমায় ভাসমান বিভিন্ন কোষীয় উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত লাল বর্ণের তরল যোজক কলা (Connective Tissue)। রক্ত কণিকাসমূহ উৎপন্ন হয়ে থাকে অস্থি মজ্জা (bone marrow) থেকে। তবে দুই ধরনের শ্বেতরক্ত কণিকা (টি-সেল ও বি-সেল) উৎপন্ন হয় শরীরের লিম্ফ নোড ও স্প্লিনে (lymph nodes and spleen)।

রক্তের কাজ

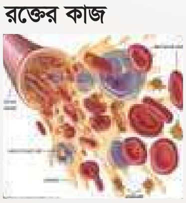

রক্তের কাজ শরীরের সকল অঙ্গের কোষে অক্সিজেন, পুষ্টিদ্রব্য, কার্বন ডাই অক্সাইড ও অন্যান্য বর্জ্য পণ্য বহন করা। রক্ত একটি পরিবহন তরল যা হৃদপিণ্ডের সাহায্যে (পাম্পের মাধ্যমে) শরীরের সমস্ত অংশে প্রবাহিত হয়ে প্রক্রিয়াটি পুনরাবৃত্তি করার জন্য আবার হৃদপিণ্ডে গিয়ে যাত্রা শেষ করে। মানবদেহে প্রাণশক্তি থাকা অবধি এ প্রক্রিয়াটি চলমান থাকে। রক্ত একটি টিস্যু ও একটি তরল–উভয়ই। ফুসফুস বিশুদ্ধ অক্সিজেন রক্তের মাধ্যমে সারা শরীরে সরবরাহ করে এবং দেহ কোষে উৎপন্ন দূষিত কার্বন ডাই অক্সাইড

ফুসফুসে পরিবাহিত করে। কিডনি অতিরিক্ত জল, দ্রবীভূত বর্জ্য পদার্থ অপসারণ করে রক্তের মাধ্যমে। প্রাত্যহিক খাবারের মাধ্যমে প্রাপ্ত পুষ্টি উপাদানসমূহ গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল ট্রাক্ট দ্বারা শোষণের পরে রক্ত প্রবাহে পৌঁছায় এবং সারা শরীরে পরিবাহিত হয়। শরীরের এন্ডোক্রাইন সিস্টেমের গ্রন্থিগুলো হতে নিঃসরিত হরমোনসমূহ রক্তের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট টিস্যুতে পরিবাহিত হয়ে তাদের কার্যক্রম/প্রভাব প্রয়োগ করে। এছাড়া, বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হলে ডাক্তারের প্রেসক্রাইবকৃত ঔষধ লিভারে পরিপাকের পর রক্তের মাধ্যমে কার্যকর স্থানে পৌঁছায়। মানবদেহের সকল কার্যক্রমে রক্তের সম্পৃক্ততা অকল্পনীয় ও অবর্ণনীয়।

রক্তের ভাষা প্রকাশের উপাদান

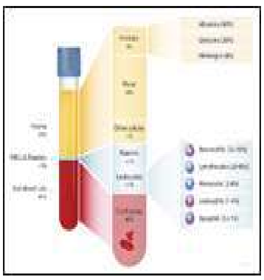

প্লাজমা (রক্তরস) ও প্লাজমায় ভাসমান বিভিন্ন কোষীয় উপাদান (লাল বর্ণের লোহিত রক্তকণিকা, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা-শ্বেত রক্তকণিকা, রক্ত জমাট বাধার উপাদান-অনুচক্রিকা), গুরুত্বপূর্ণ সব আয়ন, প্রোটিন, হরমোনসহ নানা প্রকার কেমিক্যাল কম্পোনেন্ট। রক্ত শরীরের সব প্রান্তে বিশুদ্ধ অক্সিজেন পরিবহন করে এবং শরীর থেকে সব ধরনের বর্জ্য পদার্থ অপসারণে সাহায্য করে। শরীরের সব ধরনের কেমিক্যাল উপাদান, রোগের উপশমের জন্য সেবনকৃত ঔষধ এবং রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুও এই রক্তের মাধ্যমে বাহিত হয়। রক্তে উপস্থিত প্রতিটি উপাদান একজন প্রাণীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। রক্তের এক একটি উপাদান এক একটি ভাষা প্রকাশ করে।

রক্তের ভাষা বুঝার উপায়

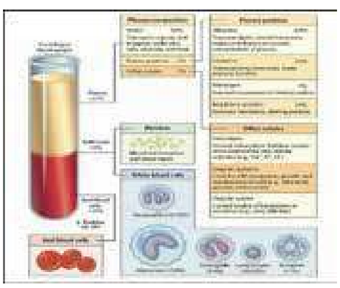

মানব শরীরের রক্তে যেসকল উপাদান উপস্থিত থাকে, সেসকল উপাদান নিজ উদ্যোগে/উদ্ভূত উপসর্গের পরিপ্রেক্ষিতে ডাক্তারের পরামর্শে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে পরীক্ষা করে আমরা রক্তের ভাষা জানতে পারি। আধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে যান্ত্রিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সে উপাদানগুলোর অবস্থা/পরিমাণ/মাত্রা জানার মাধ্যমে রক্তের ভাষা বুঝা সহজতর হয়। আমরা যদি সে ভাষা বুঝি তবে আমাদের মূল্যবান দেহঘড়ির অবস্থা জানতে পারবো। এনিমিয়া বা রক্তশূন্যতা হলো রক্তের একটি ভাষা যার মাধ্যমে ৫ ধরনের রক্তশূন্যতা সম্পর্কে জানা যায়। রক্তের বিলিরুবিন জন্ডিসের মাত্রা প্রকাশ করে, রক্তের ট্রপোনিন-আই হার্ট অ্যাটাক, হার্টের ক্ষতিকর ঝুঁকি ও মাত্রা নির্দেশ করে, রক্তের নন স্ট্রাকচারাল প্রোটিন (এনএস১) ডেঙ্গু রোগের উপস্থিতি প্রকাশ করে, IgE শরীরে এলার্জিক উপাদানের মাত্রা নির্দেশ করে, রক্তের Serum Creatinine কিডনির সক্রিয়তা প্রকাশ করে, Serum Electrolyte শরীরে মিনারেলের মাত্রা নির্দেশ করে, ESR শরীরের অভ্যন্তরে ইনফেকশনের উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিত করে, Serum Platelate-এর পরিমাণ শরীরে রোগের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সক্ষমতা নির্দেশ করে। এমনিভাবে শত শত রোগের উপস্থিতি, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের অসুস্থতার মাত্রা/তীব্রতা/নিশ্চয়তা নিশ্চিতকরণের জন্য রক্তের সংশ্লিষ্ট উপাদানগুলো যথাযথ ক্লিনিক্যাল পরীক্ষার মাধ্যমে রক্তের ভাষা উপলব্ধি করে ডাক্তাররা স্বাস্থ্য সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন।

জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবার রক্তই লাল। এর মধ্যে কোনো বিভেদ নেই। মানুষের শরীরে রক্তের প্রয়োজনীয়তা এতো বেশি যে, রক্ত ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না। মুমূর্ষু রোগীকে তার শারীরিক ক্রান্তিলগ্নে বাঁচাতে রক্তের প্রয়োজনীয়তা বেশি অনুভূত হয়। মুমূর্ষু রোগীকে রক্তদানের ক্ষেত্রেও রক্তের ভাষা বুঝতে হয়। রক্তের ABO Blood group এবং Rh Factor (+/-) পরীক্ষার মাধ্যমে দাতা ও গ্রহীতার রক্তের মিল নিশ্চিত করা হয়। তাই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় যদি রক্তের ভাষাজ্ঞান জানার জন্য পরিকল্পিত উপায়ে ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা যায় তবে একজন মানুষ তার দেহঘড়ি সম্পর্কে সচেতন হতে পারবে। শরীরের সুস্থতার প্রতি যত্নবান হতে আরো বেশি আন্তরিক হবে। আর একজন স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ সার্বিকভাবে একটি পরিবার, সমাজ ও দেশের মূল্যবান সম্পদ হিসেবে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

তথ্য সূত্র

1. Photo: https://www.parkwaycancercentre.com/in/news-events/news-articles/news-articles-details/6-common-types-of-blood-tests-e-g-cancer-blood-test-explained, https://openmd.com/guide/blood-components
2. https://ybestbuyar.best/product_details/21687259.html
3. Blood Cell: https://biologydictionary.net/blood-cell/
4. গুগল ও উইকিপিডিয়া।
5. নিউজপেপার।

উন্মুক্ত ইন্টারনেটে মুক্তপেশা–চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

প্রলয় মুখার্জী
সহকারী প্রোগ্রামার
পাবলিক রিলেশন্স, ইনফরমেশন অ্যান্ড পাবলিকেশন্স

আজকের এই সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা যে ফ্রিল্যান্সিং বলতেই বুঝি 'ইন্টারনেটে কিছু একটা করা', সেটা আসলে কাজের ক্ষেত্রের বিশালতার জন্যেই। সারাদেশে ফ্রিল্যান্স ফটোগ্রাফারের সংখ্যা হাতের কর গুণেই বলা যাবে হয়ত কিন্তু ফ্রিল্যান্স ওয়েব ডেভলপারের সংখ্যা বের করার জন্যে বিস্তর সার্ভে করার দরকার পড়বে। তবে নিঃসন্দেহে সেই সংখ্যা যে অনেক অনেক গুণ বেশি তা সার্ভে না করেই বলা যায়। মুক্তবাজার অর্থনীতির দুনিয়ায় উন্মুক্ত ইন্টারনেটের উন্মুক্ত জ্ঞানভাণ্ডার, আমাদের মতো জনবহুল তারুণ্য নির্ভর দেশের জন্যে এই সুযোগ দেশের, বিরাট সংখ্যক তরুণের জীবন পাল্টে তো দিচ্ছেই একই সাথে দেশের জন্যে নিয়ে আসছে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা। আমরা যদি পত্রিকার বহুল প্রচলিত নিউজগুলো যেমন 'ঘরে বসেই মাসে ১০ লাখ টাকা আয় করেন অমুক', সেগুলোকে সন্দেহের চোখে দেখেই আশেপাশে দেখি তাহলেও আমরা 'ইন্টারনেটে কিছু একটা করে' সচ্ছল স্বাবলম্বী জীবনের প্রচুর উদাহরণ দেখতে পাবো।

ঘরে বসে ইন্টারনেটে কাজ করে উপার্জনের মোটাদাগে যে দুটো প্রচলিত উপায় আছে, তার একটা হচ্ছে ফ্রিল্যান্স বা গিগ ভিত্তিক কাজ অন্যটা রিমোট চাকুরি।

আমাদের দেশে প্রথমটাই বেশি প্রচলিত সহজলভ্যতার কারণে। সাধারণত মার্কেটপ্লেসগুলোতে বিভিন্ন কাজের জন্যে এডভার্টাইজ করা হয়, ফ্রিল্যান্সাররা সেই কাজ নিয়ে করেন এবং কাজ অনুযায়ী পেমেন্ট পান। রিমোট চাকুরি আসলে দেশের অন্য যে কোনো চাকুরির মতোই। চাকুরিতে এপ্লাই করা হয়, ইন্টারভিউ দেয়া হয় তারপর কোম্পানি নিয়োগ দেয়। শুধুমাত্র পার্থক্য কাজটা ঘরে বসেই করা যায় আর একটা বড় পার্থক্য বেতনের পরিমাণ সাধারণত দেশের প্রচলিত বেতনের চেয়ে বেশি হয়। আমাদের দেশের ব্যাংকগুলো এখন ইন্টারনেট থেকে টাকা দেশের একাউন্টে নিয়ে আসা বেশ সহজ করে দিয়েছে, সাথে বাংলাদেশ ব্যাংক কিছু ইন্সেন্টিভও দেয়, বৈদেশিক মুদ্রা দেশে নিয়ে আসার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ।

এ এক অপার সম্ভাবনার সময়। খুলনার কোনো এক বাসার ছোট্ট ঘরে বসেই কেউ একজন কাজ করছে ক্যালিফোর্নিয়ার এক ফিনটেক স্টার্টআপে। অথবা ঢাকার কোনো এক মেসে কয়েক বন্ধু মিলে অনলাইন-মার্কেটিংয়ের কাজ করছে কোনো এক জার্মান ক্লাইন্টের জন্যে। এইসব সম্ভব হচ্ছে যেসব কারণে তার মধ্যে প্রথমেই থাকবে ইন্টারনেটের উন্মুক্ত জ্ঞানভাণ্ডার। এখন এই সময়ে এমন কোনো বিষয় নেই যেটা ইন্টারনেট থেকে অন্তত বেসিক শেখার সুযোগ নেই। নানা রকম ফরম্যাট টেক্সট, অডিও, ভিডিও, কোর্স, লেসন, ক্লাস; আছে প্রচুর পরিমাণে, যেগুলো ফ্রি কিন্তু কোয়ালিটি কন্টেন্ট। একটু সময় আর মনোযোগ দিয়ে পরিশ্রম আর শেখার মানসিকতা থাকলেই নিজের স্কিলসেট তৈরি করে নেয়া যায় যে কারো পক্ষেই। আর দ্বিতীয়ত উন্মুক্ত বাজার। সারা পৃথিবী এখন সহজে প্রতিযোগিতামূলক দামে কাজ করাতে চায় সেখানে কে কোথায় বসে কাজ করছে সেটা আর গুরুত্বপূর্ণ নয়। ফলে এই বাজার আর সম্ভাবনা দিন দিন বাড়ছেই। তৃতীয়ত যেই কাজের জন্যে যেই স্কিলসেট তার বাইরে খুবই বেসিক কিছু বিষয় যেমন মোটামুটি ইংরেজি বলা-লেখা বা কমুনিকেশন স্কিল ছাড়া আর কোনো যোগ্যতা যেমন শিক্ষাগত যোগ্যতা, ট্রেনিং এসব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে না।

এই ব্যাপক সম্ভাবনার সাথেই আছে ব্যাপক চ্যালেঞ্জ। উন্মুক্ত বাজার উন্মুক্ত জ্ঞান তো শুধুই আমাদের দেশের জন্যে না, পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের যে কারো জন্যেই। ফলে কাজের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বাড়ছে, ক্লাইন্ট বা কোম্পানির দক্ষতা যাচাইয়ের সুযোগ বাড়ছে, সাথে সাথেই কাজের মূল্য কমছে। দুঃখজনক হলেও সত্যি আমাদের দেশের বেশিরভাগ তরুণের মধ্যেই সময়, পরিশ্রম ও মেধা কাজে লাগিয়ে দক্ষ প্রতিযোগী হয়ে উচ্চমূল্যে কাজ করতে পারার যোগ্যতা অর্জনের চেয়ে খুব তাড়াতাড়ি কিছু শিখে

ফেলে কম মূল্যে কিছু উপার্জনের প্রবণতাই বেশি। সেটা স্বল্পমেয়াদে কাজও করে এবং যেহেতু ডলার থেকে টাকা বিনিময় রেট অনেক বেশি তাই এই স্বল্পমূল্যও অনেকের ক্ষেত্রেই স্বল্প থাকে না। কিন্তু সময়ের সাথে, নতুন অর্থনৈতিক বাস্তবতার সাথে কিংবা নতুন দক্ষ প্রতিযোগিদের সাথে দীর্ঘমেয়াদে টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে। এই স্বল্পমেয়াদি প্রবণতাকে পুঁজি করে আবার গড়ে উঠছে অদক্ষ বাণিজ্যিক কোচিং, যেখানে ৬ মাসের কোর্স করেই মাসে ২ লাখ টাকা উপার্জনের অবাস্তব আশ্বাস দেয়া হয়। এর পাশাপাশি আছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই এর ব্যাপক শক্তিশালী হয়ে ওঠা। অনেক কাজই এখন এআই দিয়ে খুব দ্রুত এবং প্রায় ত্রুটিমুক্ত ভাবেই করে ফেলা সম্ভব। এই চ্যালেঞ্জের তালিকা আরো দীর্ঘ। প্রথাগতভাবেই আমাদের পেশাদারিত্ব, কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা তৈরি, সময়ের সাথে নিজের যোগ্যতা বৃদ্ধি, সময়ানুবর্তিতা ও টিম ওয়ার্কের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে চেষ্টার ঘাটতি অনেক; বিশেষত উন্নত দেশগুলোর তুলনায়। যেহেতু এই প্রতিযোগিতাটাই আন্তর্জাতিক, সারা পৃথিবীর যেকোনো দেশের যে কেউ এর প্রতিযোগী, আর সেহেতু আন্তর্জাতিক বাজারের মতোই এই দুর্বলতা আমাদের জন্যে পিছিয়ে পড়ার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

আমাদের এগিয়ে থাকতে এমনকি টিকে থাকতে হলেও দক্ষতা আর পেশাদারিত্ব আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার কোনো বিকল্প নেই। অনেক প্রতিকুলতার মধ্যেও আমাদের জনবল আছে, মেধা আছে, কাঠামোগত সীমাবদ্ধতাও আছে। প্রথমেই আমাদের তরুণদের স্বল্পমেয়াদি প্রথাগত মানসিকতা থেকে বের হতে হবে। নিজেকে আন্তর্জাতিক মানের দক্ষ করে তুলতে সময়, মেধা, শ্রম দিয়েই আগামী অর্থনৈতিক বাজারের জন্যে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। শেখার ক্ষেত্রে টুলস বা টেকনোলজিকে গুরুত্ব না দিয়ে বরং নতুন টুলস বা টেকনোলজি কীভাবে দ্রুত সময়ে রপ্ত করা যায় সেই মাইন্ডসেট তৈরি করতে হবে। এই সময়ের বেশ আলোচিত ইতিহাসবিদ নোয়া হারারি বলেছিলেন একবিংশ শতকে জ্ঞান হতে হবে টেন্ট বা তাবুর মতো, যেন চাইলেই স্থানান্তর করা যায়। একটা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে বিষয়টা আরো একটু ভালো বোঝার জন্যে। ধরা যাক আমি ওয়েব ডিজাইনের জন্যে ফটোশপ বা ইলাস্ট্রেটর ব্যবহার করি। আজকের দিনে ফিগমা একই কাজের জন্যে আরো বহুল ব্যবহৃত এবং বেশ কিছু বাড়তি সুবিধা দেয়। এক্ষেত্রে আমার ওয়েব ডিজাইন দক্ষতা কি আমি দ্রুত সময়ে ফিগমায় নিতে পারি? নাকি ফটোশপ ছাড়া আমার পক্ষে ওয়েব ডিজাইন করাই সম্ভব না? ফটোশপ একটা টুল মাত্র। দক্ষতা টুল নির্ভর হয়ে গেলে আমি আর পরিবর্তনের সাথে নিজেকে আপডেট করতে পারছি না। ফলে টিকে থাকতে গেলে নতুন বিষয়ের সাথে দ্রুত পরিচিত হওয়া জরুরি।

টেক সেক্টরের মতো এতো দ্রুত পরিবর্তন আর কোনো সেক্টরে নেই। পোস্ট অফিসের চিঠি থেকে টেলিফোন কলে আসার সময়কাল পঞ্চাশ বছরেরও বেশি। সেই টেলিফোন কল থেকে মোবাইল, মোবাইল থেকে ইন্টারনেট কল, ইন্টারনেট কল থেকে ভিডিও কল এই সব কিছুই গত দশ বছরে। ফলে এখন কী আছে সেটাও আর গুরুত্বপূর্ণ থাকছে না যদি সামনে কী আসছে সেটা অনুধাবন না করা যায়। সেজন্যে আগামী পরিবর্তনের সাথে নিজেকে পরিচিত রাখা এবং সে অনুযায়ী নিজের দক্ষতাকে রুপান্তর জরুরি। এই পরিচিত হওয়া বা নিজের দক্ষতার আপডেট সবই মুক্ত ইন্টারনেটে অবারিত। শুধু দরকার এই মাইন্ডসেটে নিজেকে নিয়ে যাওয়া।

ইন্টারনেটে মুক্ত পেশা যেমন বিরাট সম্ভাবনা তার সাথেই আছে অনেক চ্যালেঞ্জ। আমাদের তরুণরা আগামীর পরিবর্তনের সাথে নিজেদের দক্ষতা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার মানসিকতা তৈরি করতে পারলেই এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো সম্ভব।

স্বাধীনতা ও শান্তি

জাহরা আনজুম
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস

ফাতেমাকে জানালার পাশে মনমরা হয়ে বসে থাকতে দেখে দাদু জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার দাদুমণি, এভাবে মন খারাপ করে বসে আছ কেন? দাদুকে দেখে ফাতেমার মুখে একচিলতে হাসি ফুটে উঠলো। ফাতেমার প্রিয় মানুষদের একজন হলো তার দাদু। সময় পেলেই তারা একসাথে গল্প করে।

ফাতেমা তার দাদুকে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা দাদু, আমাদের নিজ দেশে, কিংবা পৃথিবীর নানা দেশে যে অশান্তি, মারামারি-হানাহানি হচ্ছে, তা কি বন্ধ করার কোনো উপায় নেই? কিছু মানুষ যে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, তার জন্য কেন সাধারণ সকল মানুষকে ভুক্তভোগী হতে হবে? সমাজে বদল আনার কি কোনো উপায়ই নেই?

দাদু বললেন, এত প্রশ্ন এক সাথে? বুঝতে পেরেছি, দেশ-বিদেশের নানান অরাজকতা আর অশান্তি দেখে আমার প্রিয় ফাতেমার মন খারাপ হয়েছে। আচ্ছা চলো, আজকে তোমার সাথে একটা নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। বলো তো দাদুমণি, মানুষ কেন সৃষ্টির সেরা জীব?

কারণ মানুষের বুদ্ধি ও বিবেক আছে। মানুষ নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন হয় দাদু।

ঠিক বলেছ। আর সকল মানুষের লিঙ্গ-ধর্ম-বর্ণ-জাত যা-ই হোক না কেন, ভেতরে কিন্তু সকলের একই রক্ত ও মাংস। সকলে একই স্রষ্টার সৃষ্টি। এজন্য প্রতিটি মানুষের মানব-মর্যাদা সমান। জানো দাদুমণি, আমাদের এই বাহ্যিক রূপ, জীবনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য ভিন্ন হলেও চূড়ান্ত লক্ষ্য কিন্তু একই। বলতে পারো কিভাবে?

ফাতেমা বেশ খানিকক্ষণ ভেবে জবাব দিলো, আমরা সকলেই সুখী থাকতে চাই, সুন্দর ও সচ্ছল জীবনযাপন করতে চাই, কাছের মানুষদের নিয়ে ভালো থাকতে চাই। তাই না দাদু?

দাদু ফাতেমার বুদ্ধিমত্তায় চমৎকৃত হয়ে বললেন, ঠিক তাই! ধর্ম-বর্ণ-জাত-পাত-উচ্চবিত্ত-নিম্নবিত্ত নির্বিশেষে সকল মানুষ দিনশেষে সুখী হতে চায়। আমাদের সকল কাজ বা উদ্দেশ্যের অন্তিম লক্ষ্য একটিই–সুখী জীবনযাপন করা। দাদুমণি, তুমি হয়ত খেয়াল করেছ, যখন আমরা একই লক্ষ্য অর্জনে একসাথে কাজ করি, তখন সকলে আপনাআপনি ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাই, নিজেদের সর্বোচ্চটুকু দিয়ে লক্ষ্য অর্জন করতে চাই। লক্ষ্য পূরণের এই যাত্রায় কেউ যদি কোনো ভুল করেও ফেলে, অন্যদের অবদানে সেই ভুলটি অনেক ক্ষেত্রে সংশোধিত হয়ে যায়, তাই না?

ফাতেমা ভেবে দেখল, তাই তো! যেকোনো লক্ষ্য অর্জনে একসাথে কাজ করলে আমাদের মধ্যেকার সব বিভেদ, মনোমালিন্য আপনাআপনি দূর হয়ে যায়। সকলে তখন একটা দলের মতো হয়ে নিজেদের সেরাটা দিয়ে লক্ষ্য অর্জন করতে চায়। খেলাধুলা থেকে শুরু করে সব ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য।

এবার ভেবে দেখ দাদুমণি, পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ সুখী হতে চায়। এখন আমরা সকলে যদি এই একই লক্ষ্য অর্জনে আলাদাভাবে চেষ্টা না করে একসাথে দল হয়ে চেষ্টা করি, তবে কি কোনো যুদ্ধ, মারামারি-হানাহানি, বিভেদ সৃষ্টি হবে?

বাহ! এমন হলে তো পৃথিবী খুব সুন্দর হয়ে উঠবে। এই কথাটা তাহলে সবাই বোঝে না কেন দাদু?

হয়ত বোঝে, কিংবা বুঝতে চায় না। ভোগ, শোষণ ও দখলদারিত্বের মাধ্যমে হয়ত সাময়িকভাবে লাভবান হতে পারবে কেউ।

কিন্তু ঐ চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন করতে হলে, প্রকৃত সুখ অর্জন করতে চাইলে, নিজেদের স্বাধীনতার যথাযথ প্রয়োগ করে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সে লক্ষ্যপূরণে কাজ করতে হবে। এতেই সকল বিভেদ দূর হবে, জীবন হবে সুখ-শান্তিময়।

কিন্তু দাদু, এখানে আমাদের স্বাধীনতার প্রসঙ্গ আসছে কিভাবে?

ভালো প্রশ্ন করেছ দাদুমণি। আচ্ছা, বলো তো, স্বাধীনতা মানে কী?

ফাতেমা বললো, স্বাধীনতা মানে মুক্তি। বাধা, প্রতিবন্ধকতা ছাড়া যেকোনো কিছু করতে পারার ক্ষমতা।

তুমি ঠিকই বলেছ দাদুমণি। তবে, যদি সামাজিক বিজ্ঞান ও নৈতিক মূল্যবোধের আলোকে বলি, তাহলে স্বাধীনতা মানে হলো মুক্তভাবে নিজের বোধ-বুদ্ধি, যোগ্যতা ও মননশীলতার চর্চা করে নিজের ও অপরের কল্যাণ করার সুযোগ। এখন কেউ যদি এই সুযোগ ব্যবহার করে নিজের ও অপরের কল্যাণে অবদান রাখে, তখন তাকে বলা যায় স্বাধীনতা। নয়ত তা হবে স্বেচ্ছাচারিতা।

ফাতেমাকে কিছুটা বিভ্রান্ত দেখে দাদু বললেন, আচ্ছা উদাহরণ দিয়ে তোমাকে বোঝাই। যারা মাদকাসক্ত, তারা সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে ও এতে আনন্দ পায়। কিন্তু এটাকে তাদের স্বাধীনতা বলা যায় না। কারণ তারা একদিকে যেমন নিজের ক্ষতি করছে, তেমনি অর্থের অপচয় এবং পরোক্ষভাবে অন্যদেরও মাদকদ্রব্য গ্রহণে উৎসাহিত করছে। এটা এক ধরনের স্বেচ্ছাচারিতা। আবার, একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ যদি শিশুপার্কের দোলনায় উঠেন, তখন তিনিও আনন্দ পাবার জন্য তা করেন। এতে তাকে দেখে কেউ হাসাহাসি করলেও, তিনি নিজের বা অন্যের কোনো ক্ষতি করছেন না। বরং এভাবে তিনি স্বাধীনভাবে নিজের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ করছেন।

ফাতেমা বললো, তার মানে, শুধু নিজের ইচ্ছামতো যা খুশি তা করাই স্বাধীনতা নয়। তাতে নিজের ও অন্যের কল্যাণের কথা ভাবতে হবে?

হ্যাঁ দাদুমণি। স্বাধীনতা মানে কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়া, নিজের সমাজ, সংস্কৃতি, নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, এমন যেকোনো কিছু করতে পারার অধিকার। এতে নিজের ও অপরের কল্যাণ যদি না-ও হয়, তবু কোনো অকল্যাণ যেন না হয় তা খেয়াল রাখতে হবে।

ব্যাপারটা তো দারুণ! তাহলে দাদু, যদি আমরা নিজেদের স্বাধীনতার যথাযথ প্রয়োগ করতে পারি, তবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সুন্দর ও সুখী জীবনযাপনের লক্ষ্য অর্জন করা আমাদের জন্য অনেক সহজ হবে, তাই না? কারণ স্বাধীনতার সঠিক প্রয়োগ করতে চাইলে আমাদের নিজেদের ও অপরের যেন কোনো অকল্যাণ না হয়, সে কথা বিবেচনায় রাখতে হবে।

একদমই তাই! সেটা হয়ত অসম্ভব কিছু নয়, ফাতেমা। তবে অনেকেই স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতাকে এক ভেবে ভুল করে বসে। এই ভুল ছোট থেকে বড়, এমনকি বিশ্বের বড় বড় নেতারাও করে থাকেন। তাছাড়া, অনেক ক্ষেত্রে কোনো বাধা ছাড়া নিজের যৌক্তিক মত, বুদ্ধি, যোগ্যতার প্রকাশ ঘটানোর মতো সুযোগও থাকে না। তখন তাকে একপ্রকার পরাধীনতা বলা যায়।

ব্যাপারটা অনেক সহজ করে বুঝিয়েছ দাদু। আগে কখনো এভাবে উপলব্ধি করি নি। আফসোস! এই বিষয়টি যদি সবাই বুঝত, তাহলে তো পৃথিবীতে কোনো অশান্তিই থাকত না।

বদল তো একদিনে আসে না দাদুমণি। ধীরে ধীরে আসে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানুষ এসকল বিষয় নিয়ে ভেবেছেন ও সমাজের বদল আনার চেষ্টা করেছেন। এখন তোমাদের ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হাত ধরে আরও বদল আসবে। প্রয়োজন শুধু সচেতনভাবে নিজের স্বাধীনতার প্রয়োগ করা, সকলের মানব-মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা। ঐক্য তখন এমনিতেই আসবে। হ্যাঁ, অশান্তি, হানাহানি হয়ত সবসময়ই কিছুটা থাকবে। কারণ সব মানুষ যে সবটা বুঝবে এমনটা আশা করা তো বোকামি। তবে তার জন্য এভাবে মন খারাপ করে বসে না থেকে নিজের দায়িত্বটুকু সচেতনভাবে পালন করতে হবে।

কে বললো আমার মন খারাপ? তুমি থাকতে কি আমার মন খারাপ হতে পারে দাদু?

দাদু হেসে ফাতেমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। তারা বারান্দায় এসে একসাথে পড়ন্ত বিকেলের রোদের সৌন্দর্য উপভোগ করতে থাকে। তাদের বুকে অনেক আশা, আর চোখে একটি সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন।

বিভিন্ন সংস্কৃতিতে নববর্ষ

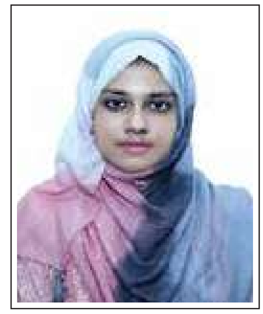

রুবাইয়াত সানজিনা রানিলা
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন

বাঙালির অন্যতম প্রাণের উৎসব বাংলা নববর্ষ বা পহেলা বৈশাখ। মূলত বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি সারা বিশ্বের বাঙালির কাছে বেশ তাৎপর্য বহন করে এটি।

কেবল বাংলাদেশ ও ভারতে নয়, বরং নিজ নিজ ঐতিহ্য আর রীতিনীতি অনুযায়ী প্রতি বছর নতুন বছরকে বরণ করে এশিয়া তথা দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ। এর মধ্যে নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার, কম্বোডিয়া, লাওস ও থাইল্যান্ড বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কোনো অব্দের প্রথম দিন নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে পূর্বে দুইটি বিষয় বিবেচনা করা হতো: জ্যোতিষশাস্ত্র এবং খাজনা আদায়ের সুবিধা। জ্যোতিষশাস্ত্রে বিভিন্ন নক্ষত্রের মধ্যে কল্পিত রেখা টেনে বৃষ, কর্কট, সিংহ প্রভৃতি ১২টি রাশি কল্পনা করা হয়। প্রতি মাসে সূর্য নতুন রাশিতে প্রবেশ করার এই সময়টি 'সংক্রান্তি' নামে পরিচিত। এশিয়ার বিভিন্ন দেশে নববর্ষের প্রথম দিন মূলত অর্থনৈতিক কারণে অথবা ফসল ঘরে তোলার পর খাজনা আদায়ে সুবিধাজনক বলে নির্ধারণ করা হয়েছে।

নদীমাতৃক বাংলাদেশে পহেলা বৈশাখ
নতুন বছরের উৎসবের সঙ্গে গ্রামবাংলার সংস্কৃতি ওতোপ্রতোভাবে জড়িয়ে আছে। সাধারণত কোনো খোলা মাঠে বৈশাখী মেলার আয়োজন করা হয় যেখানে থাকে বিভিন্ন রকম শিল্পজাত সামগ্রীর বিপণন, থাকে নানারকম পিঠা পুলির আয়োজন। এই দিনের একটি পুরানো সংস্কৃতি হলো গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন। যেমন : নৌকাবাইচ, লাঠি খেলা, বলী খেলা ইত্যাদি। বর্তমানে সর্বজনীনভাবে বিভিন্ন আয়োজনের মধ্য দিয়ে দিনটি পালিত হচ্ছে। যদিও অতীতের বিভিন্ন সংস্কৃতি যেমন : পটশিল্প, মৃৎশিল্প, বায়োস্কোপ, শাকান্ন, হালখাতা ইত্যাদি সময়ের সাথে আধুনিকতার ছোঁয়ায় অনেকটা হারিয়ে যেতে শুরু করেছে।

বাঙালি জনগোষ্ঠীর বাইরে এই সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত ১১ ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, বৃহত্তর সিলেট জেলার মনিপুরী জনগোষ্ঠী নববর্ষ উদযাপন করে।

ত্রিপুরাদের বৈসু, মারমাদের সাংগ্রাই ও চাকমাদের বিজু উৎসব যা বৈসাবি (উৎসব তিনটির নামের আদ্যাক্ষর নিয়ে গঠিত) নামে পরিচিত। চাকমারা চৈত্র মাসের শেষ দুইদিন পালন করে বিজু। যার প্রথম দিনে 'ফুল বিজু', দ্বিতীয় দিনে 'মূল বিজু' ও শেষ দিনকে 'গোর্য্যাপর্য্যার দিন' বলে তারা তিন দিনব্যাপী নববর্ষ উদযাপন করে। তারা পুরানো বছরের বিপদাপদ দূর করার জন্য নদীতে গোসল করে।

অপরদিকে চাকমাদের ন্যায় ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীও পহেলা বৈশাখের দুইদিন আগে বৈসু বা বৈসুক নামে নববর্ষ পালন করে থাকে। যার প্রথমদিনে থাকে হারি বৈসু, দ্বিতীয় দিনে বিসুমা ও তৃতীয় দিনে অর্থাৎ পহেলা বৈশাখের দিন থাকে আতাদাক বা বিসিকাতাল।

মারমা আর রাখাইন আদিবাসী গোষ্ঠীর কাছে নববর্ষের উৎসব সাংগ্রাই নামে পরিচিত। এ দিন পানি ছিটানোর 'জলকেলি' উৎসব হয়ে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ম্রো জনগোষ্ঠীও পহেলা বৈশাখে 'চাংক্রান পোই' নামে নববর্ষ উদযাপন করে থাকে।

বৈচিত্র্যময় ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে নববর্ষ

ব্রিটিশ শাসনের সময় গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের প্রচলন শুরু হয়। তবে এর অনেক বছর আগে পঞ্জিকা দেখে যে সকল দিন উদযাপন করা হতো, সেগুলো এখনো ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে পালন করা হয়। তবে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন নামে তা পালিত হয়ে থাকে। যেমন : পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরাতে পহেলা বৈশাখ, কেরালায় ভিষু, পাঞ্জাবে বৈশাখী, আসামে বিহু, উড়িষ্যায় পান সংক্রান্তি, তামিল নাড়ুতে পুথান্দু।

নতুন বছরকে বরণের পাশাপাশি বৈশাখের প্রথম দিনে হালখাতা পার্বণে মেতে ওঠেন এখানকার বাঙালিরা। পাশাপাশি সিদ্ধিদাতা গণেশ এবং লক্ষ্মীপূজা করেন ব্যবসায়ীরা। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী আজও বঙ্গাব্দের প্রথমদিনে কলকাতার বৌবাজার এলাকায় হালখাতা পালিত হয়। পশ্চিমবঙ্গসহ উপরে উল্লেখিত ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাদেশের মতোই বেশ জাঁকজমক-পূর্ণভাবে নববর্ষ উদযাপিত হয়।

উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলের মতো পশ্চিমবাংলায় ১৪ বা ১৫ এপ্রিলে নববর্ষ উদযাপিত হয়। তবে জ্যোতির্বিজ্ঞানী মেঘনাথ সাহা ও তাঁর প্রবর্তিত শকাব্দ সনের সংস্কারের কিছু সংস্কার সাধন করে ভারত সরকার পান্ডে কমিটির যে সংস্কার প্রস্তাবটি গ্রহণ করে, সেখানেও সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ১৪ এপ্রিলেই পয়লা বৈশাখ উদযাপিত হবে। প্রাচীন সংস্কার এবং পঞ্জিকা ব্যবসায়ীদের আধিপত্যের কারণে ১৪ বা ১৫–এই দুই দিনের যেকোনো দিন নববর্ষ উদযাপিত হয়।

ভারতের তেলেগু বা কন্নর অঞ্চলেও মার্চ বা এপ্রিল মাসেই নববর্ষ উদযাপিত হয়। দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ ও কর্ণাটক রাজ্যে 'যুগাদি' অর্থাৎ নতুন বছর শুরু হয় চৈত্র মাসে। তামিলনাড়ুতেও একই রীতি অনুসরণ করা হয়। তবে কাশ্মীরে নববর্ষ শুরু হয় ১৯ মার্চ। আবার মহারাষ্ট্রে নববর্ষ অন্ধ্রপ্রদেশের মতোই যুগাদি রীতি অনুযায়ী পালিত হয়ে থাকে।

তামিল ভাষায় নববর্ষ পরিচিত 'পুটুবর্ষ পিরাপ্পু' নামে আর এপ্রিল মাসকে তারা বলে 'চিহিরাই' মাস। তামিলনাড়ুতে নববর্ষ পালন করা হয় পহেলা এপ্রিল। চৈত্রপূর্ণিমায় নববর্ষ পালিত হয় অন্ধ্রপ্রদেশে, কেরলে বিশু নামে নববর্ষ পালন হয় ১৪ এপ্রিল। এছাড়া কেরলের দক্ষিণ অংশে আরও একটা নববর্ষ পালন হয় ওনাম নামে যা সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে হয়।

অন্ধ্রপ্রদেশে খুব ভোরে উঠে লোকেরা কৃষ্ণা, কাবেরী আর গোদাবরীর জলে স্নান করে নতুন কাপড় পরে বেঙ্কটেশ্বর মন্দিরে পূজো দেয়।

কর্নাটকের নববর্ষ যুগাদি পালিত হয় পহেলা চৈত্রে, যা আকাশের চাঁদ দেখে শুরু হয়। আসামে নববর্ষ পালিত হয় 'বিহু' নামে যা অবশ্য উদযাপন করা হয় বছরে তিন বার। নতুন বছরে প্রথম দিনটিতে হয় বাঙালি বিহু, কার্তিক মাসে হয় কাঙালি বিহু, আর মাঘে হয় ভোগালি বিহু।

হিমালয়কন্যা নেপালে বৈশাখ আয়োজন

১৪ এপ্রিল নেপালের আনুষ্ঠানিক বর্ষপঞ্জিকা বিক্রম সাম্বাতের প্রথম দিন। বৈশাখ উৎসব নামে সর্বজনীন এক উৎসব পালিত হয় দিনটিতে। এছাড়া খাওয়া-দাওয়া, শুভেচ্ছা বিনিময়, খেলাধুলার মধ্য দিয়ে দিনটি পালিত হয়ে থাকে।

ভারত মহাসাগরের মুক্তাখ্যাত শ্রীলঙ্কায় সিনহালা নববর্ষ

সিনহালা নববর্ষ স্থানীয়ভাবে আলুথ আবুরুদ্ধা নামেও পরিচিত। মূলত সিনহালিজদের উৎসব হলেও দেশটির সকল মানুষ এ দিনটি উদযাপন করে। উৎসব চলে প্রায় এক সপ্তাহ ধরে।

নাগরিক আয়োজনের চেয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা আর খেলাধুলার আয়োজন বেশি লক্ষ্য করা যায় দিনটিতে। ডিম খেলাতে হাওয়ায় ছুড়ে দেয়া ডিম লুফে নেয়ার প্রতিযোগিতা, গরুর দৌড়, ফসলি মাঠে কাদা খেলা প্রভৃতি বেশ জনপ্রিয়।

মিয়ানমারে থিংইয়ান উৎসব

স্থানীয়ভাবে সেখানকার নববর্ষ থিংইয়ান নামে পরিচিত যা বার্মিজ ভাষায় পরিবর্তন অথবা এক জায়গা থেকে অন্যত্র স্থানান্তরকে বোঝায়। নতুন বছরের প্রথম দিনটি সাধারণত মধ্য-এপ্রিলে হয়ে থাকে। কিন্তু ঠিক নির্দিষ্ট কোন দিনে তা পালিত হবে তা নির্ভর করে মিয়ানমারের সৌর ও চন্দ্র পঞ্জিকার উপর।

এই দিনে মিয়ানমার জুড়ে পানি উৎসব হয় যা প্রায় ৫০০ বছরের বেশি সময় ধরে সেখানকার লোকজন পালন করে আসছে। নববর্ষের চারদিন আগে পানি উৎসব শুরু হয় এবং চলে নববর্ষের দিন পর্যন্ত। তাদের বিশ্বাস সব মানুষের গায়ে পানি উৎসবের পানির ছোঁয়া লাগতে হবে যার ফলে তাদের সকল পাপ মোচন হবে।

অনিন্দ্য সুন্দর লাওসের সংক্রান উৎসব

লাওস, উত্তর-পূর্ব-মধ্য মূল ভূখণ্ড দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ল্যান্ডলকড দেশ। নেপালের মতো এখানেও সৌরপঞ্জিকা অনুযায়ী বৈশাখের প্রথম দিনটি পালন করা হয়ে থাকে যা স্থানীয়ভাবে সংক্রান বা পি-মেই, নামে পরিচিত। দেশটিতে তিন দিন ধরে চলে নানা উৎসব আনুষ্ঠানিকতা।

এশিয়ার ইউরোপখ্যাত কম্বোডিয়ায় খেমার নববর্ষ

১৪ এপ্রিল খেমার নববর্ষ পালন করা হয়। এছাড়া দিনটিকে বলা হয় চাউলতানাম থিমেত অর্থাৎ নতুন বছরে প্রবেশ করা। বৌদ্ধ মন্দিরে এদিন সকালে ধর্মীয় আচার পালনের মধ্য দিয়ে দিনটির সূচনা হয়। তারপর প্যাগোডা বা বৌদ্ধমন্দির চত্বরে ঐতিহ্যবাহী নৃত্যের মাধ্যমে নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে শুরু করেন সেখানকার অধিবাসীরা। এ সময় রশি বা দড়ি টানাটানি খেলাসহ নানা ধরনের লোকজ খেলা ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

নিয়ন আলোর দেশ থাইল্যান্ডে সংক্রান উৎসব

সংক্রান শব্দটি মূলত সংস্কৃত ভাষার শব্দ সংক্রান্তি থেকে এসেছে। ১৩ এপ্রিল শুরু হয়ে এখানে উৎসব চলে ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত। তবে ২০১৮ সালে থাই সরকার ১২ এপ্রিল থেকে ১৬ এপ্রিল পর্যন্ত উৎসবটি পালন করার ঘোষণা দিয়েছে। নববর্ষে এদেশের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ পানি উৎসব যেখানে প্রায় সকল বয়সের মানুষ অংশগ্রহণ করে থাকে।

আক্ষেপ

মো. কাইয়ুম আলী
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন

চারদেয়ালে বন্দি থাকতে থাকতে হাড় হাড্ডিতে মরিচা পড়ে গেছে। তাই ইদানীং নিয়ম করে রাতের বেলা হাঁটতে বেরোই। অন্ধকারে বসে থাকার চাইতে মনুষ্য জাতির চাঞ্চল্য উপভোগ করায় এক প্রকার আনন্দই লাগে। বাজারে যেতে গলির ঠিক শেষ মাথায় বাবলু ভাইয়ের চটপটি-ফুচকার ভ্যান দেখা যাবে। মজার ব্যাপার হলো, তিনি বাচ্চাদের কাছ থেকে কোনো টাকা রাখেন না। এর পেছনের কারণটা বেশ যন্ত্রণাপূর্ণ। বছর দুই আগে রোড এক্সিডেন্টে তিনি তার ছোটমেয়ে টুম্পাকে হারান। সেদিন বাবলু ভাইকে আর্তনাদ করে কাঁদতে দেখেছিলাম। টুম্পা ফুচকা ও চটপটি খেতে খুব পছন্দ করতো। মূলত এজন্যই বাবলু ভাইয়ের এই আয়োজন। ব্যবসায় ব্যস্ত থাকলেও এক ওয়াক্ত নামাজ বাদ যায় না তার। আযান শোনা মাত্রই ব্যবসার চিন্তা যেন উবে যায়। সব ফেলে রেখে মসজিদের উদ্দেশ্যে হাঁটা দেন। তাকে দেখলে কেন যেন অজান্তেই নিজের প্রতি সূক্ষ্ম ক্ষোভ জমা হয়।

আরেকটু সামনে এগোতেই একটা ছোটখাট অসম্পূর্ণ একতলা বাড়ি চোখে পড়ে। বাড়ির সামনে একটা ছোট্ট বারান্দার মতো জায়গা। ওখানে পাটি পেড়ে বসে থাকেন এক ভদ্রমহিলা। তার চারপাশে অল্প বিস্তর কাচা সবজির ডালা থাকে। এই ভদ্রমহিলাকে আমি কোনোদিন হাসতে দেখিনি। কেমন নির্লিপ্ততায় ডুবে থাকেন সবসময়। খোঁজ নিলে জানা যায় স্বামী বিয়োগ ঘটেছে বছরখানেক হলো। জমানো টাকা দিয়ে স্বপ্নের বাড়ি গড়তে গিয়ে, সম্পন্ন করার আগেই অসুস্থতার সম্মুখীন হন ভদ্রমহিলার স্বামী। বাকি জমানো টাকা চিকিৎসায় ব্যয় করেও শেষ রক্ষা হয়নি। এখন এই অসম্পন্ন বাড়িটাই একমাত্র সম্বল। এই অসচ্ছল অবস্থার কারণে বড় মেয়েটার বিয়েও আটকে আছে। পাত্রপক্ষ একগাদা যৌতুক চেয়ে বসে। ছোট ছেলেটাকে মানুষ করার জন্য স্কুলে পাঠান। পড়ালেখা শিখিয়ে অনেক বড় করবেন ভেবে ভালো একটা স্কুলে ভর্তি করিয়েছিলেন। এখন স্কুলের ফি দিতে না পারায় পড়ালেখা বন্ধ হওয়ার উপক্রম। হয়ত এসব নিয়েই সারাক্ষণ ভাবতে থাকেন তিনি।

বাজারে ঢুকতেই বড়সড় একটা চালের গোডাউন চোখে পড়ে। রমিজ মিয়ার চালের ভান্ডার। এক প্রকার একচেটিয়া ব্যবসায় মেতে আছেন তিনি। আশেপাশে আর কারো চালের দোকান নেই। থাকলেও রমিজ মিয়ার দাপটে কেউ টিকতে পারেন না। তার শ্যালক অনেক বড়সড় একজন লোক। এই সুযোগের পূর্ণ ব্যবহার করেন তিনি। প্রায় সময়ই অতিরিক্ত লাভের আশায় চালে পাথর মিশিয়ে বিক্রি করেন। কেউ কোনো অভিযোগ করলে এক প্রকার এড়িয়েই চলে যান ব্যাপারটা। পান চিবুতে চিবুতে নিজের ও নিজের দোকানের প্রশংসা জুড়ে দেন- 'প্রায় পনেরো বছর একইভাবে ব্যবসা করতাছি। সবাই আমারে এক নামে চেনে। কুনোদিন কারো মুখে আমার আর আমার ব্যবসার নামে কুনো অভিযোগ শুনি নাই। সবাই আমারে সম্মান করে। আমিও এলাকার সবাইরে অন্তর থিকা বালোবাসি!' রমিজ মিয়া সত্যিই তার এলাকার সবাইকে খুব ভালোবাসেন। এইতো সেদিনের ঘটনা, ট্রাক থেকে চালের বস্তা নামাতে গিয়ে টাল সামলাতে না পেরে এক বৃদ্ধের কাছ থেকে বস্তাটা মাটিতে পড়ে চারিদিকে চাল বের হয়ে ছড়িয়ে যায়। রমিজ মিয়া ঘটনা দেখেই হায় হায় করে কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে এসে বৃদ্ধ লোকটাকে একটা লাত্থি দিয়ে বসলেন। মুখ ভর্তি পানের পিক থুঃ করে ফেলে বললেন, 'এই তোগো মতো বেক্কলদের লাইগা আমার ব্যবসাডার লাল বাত্তি জ্বলবো। কাম পারোস না তো কী করতে আইছোস!'

অনেক হাঁটা হাঁটি করলাম। ঘরে ফেরা দরকার। সেই পরিচিত গলি! প্রতিটি ইট পাথরে যেন আমার স্পর্শ লেগে আছে। গলির মোড়ে ভাজাপোড়ার দোকান বসে। ভাজাপোড়া খুব পছন্দের ছিল। এখন চাইলেও খেতে পারি না। কিছুদূর সামনে এগোলেই এক উঁচু বাসাবাড়ি। মাথা তুলে দেখলাম দোতলায় আলো জ্বলছে। কারণ কদিন আগে এই বাসায় ঘর আলোকিত করে এক ফুটফুটে কন্যা সন্তান জন্ম নিয়েছে। তারই যত্নআত্তি চলছে। কিন্তু ঠিক পাশের বাসাটাতে ঘুটঘুটে অন্ধকার। এরকমই অন্ধকার কয়েকমাস আগে দিন দুপুরে নেমে এসেছিল এই পরিবারটার ওপর। মধ্যবিত্ত পরিবার। মাস খানেক আগে, সকালে আবীরের

রুমের দরজা বন্ধ পাওয়া যায়। আবীর কখনোই দরজা বন্ধ করে ঘুমাতো না। আবীরকে ডেকেও কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। একপর্যায়ে দরজা ভাঙলে আবীরের মৃতদেহটা ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। পরিবারের বড় ছেলে ছিল আবীর। ভালো ছেলে হিসেবে পাড়ায় প্রচুর নামডাকও ছিল। কিন্তু আবীরের বয়সটা, কেমন যেন ছিল! এই বয়সটাতে পা রাখতেই কেমন সব হাজার রকমের অদ্ভুত চিন্তা দ্বারা ঘেরাও হয়ে পড়ে সে! লকডাউনে অনেকদিন ধরেই পরিবারের সাথে দিন পার করছিল। একপ্রকার বেকার। বাবা মার ধারণা ভার্সিটিতে উঠলেই ছেলে স্বনির্ভর হবে, পরিবারকে সাপোর্ট করবে। কিন্তু আবীর তার বাবা-মা'র প্রত্যাশা পূরণে একপ্রকার ব্যর্থ ছিল। উঠতে বসতে অবমাননার স্বীকার হতো সে। আবীর বুঝতে পারে, একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে পরিবারের সাথে থাকাটা কতোটা ভয়াবহ। শুধুই সম্পর্ক খারাপ হয়। এসব কিছু হয়তো নিতে পারে নি আবীর। তাই ঝুলে পড়েছিল। কী ভুলটাই না ছিল! এখন ভাবলেই আক্ষেপ হয়।

হাঁটতে হাঁটতে শুনশান এক জায়গায় চলে এলাম। চাঁদ উঠেছে। চারিদিকের নির্জনতা ভেদ করে রি রি শব্দে ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডেকে চলেছে। কচুরিপানায় ভর্তি পুকুর থেকে হঠাৎ হঠাৎ পানির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। কিছুদূর এগুতেই কিছু একটার সাথে হোঁচট খেয়ে পড়তে গিয়ে কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিলাম। দেখলাম কেউ একজন নিচু হয়ে কিছু একটা খুঁজছিল। এ বেটা রাফিদ। আগে ব্যাডমিন্টন খেলতাম একসাথে। ও হয়তো আমাকে ঠিক চিনতে পারে নি। চারপাশটা চাঁদের মৃদু আলোতে তেমন একটা বোঝাও যাচ্ছে না। ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি খুঁজছিলে?'

ও কেমন ভাঙা ভাঙা গলায় বললো, 'না মানে ঐ, পাঁচ টাকার কয়েন টস করতে করতে হাঁটছিলাম। হঠাৎ করেই হাত থেকে পড়ে যাওয়াতে খুঁজছিলাম আর কি! অন্ধকার তো, তাই খুঁজে খুব একটা সুবিধা করতে পারছিলাম না।'
-হা হা। তা পেলে তোমার পাঁচ টাকা?
: হ্যাঁ পেয়েছি।
-তুমি সামনের দিকেই তো মনে হয় এগোবে? একসাথেই যাওয়া যাক তাহলে?
: হ্যাঁ। সেটাই ভালো হবে। এমনিতেই রাত অনেক হয়েছে। একা হাঁটতে ভয় করে অনেক।
-ভয়! কিসের ভয়?
: ইয়ে মানে ভূতের ভয়।
-ভূতের ভয়! আজকাল তো মানুষ ভুতের চেয়ে বেশি করোনা কে ভয় পায়!
: তা যা বলেছো!

-এই যে দেখো, এতো রাত হয়ে গেছে। চারিদিক একেবারেই জনমানবশূন্য, তবু মুখ থেকে তোমার মাস্ক নামেনি।

রাফিদ হাসতে হাসতে বললো, 'একদমি খেয়াল ছিলো না খুলে রাখার কথা। একপ্রকার অভ্যাস হয়ে গেছে... এহহে তোমার পরিচয় ই জানলাম না। তোমাকে চেনা চেনাও লাগছে আবার বুঝতেও পারছি না কে তুমি। নাম কী তোমার? বাসা কোথায়, থাকো কই?'

রাফিদ অনেকগুলো প্রশ্ন একসাথে করে বসলো। আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ সময় নিয়ে আমি ওকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললাম, 'ঐ যে কড়ই গাছ টা দেখছো, ওটার নিচেই আমি থাকি।'

রাফিদ আমার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, 'মশকরা করছো?'
'কেন? মশকরা করবো কেন?'
রাফিদ বললো, 'ঐ কড়ই গাছটার নিচে গলায় দড়ি দিয়ে মারা যাওয়া আবীর ভাই এর কবর...'

কথাটা বলেই রাফিদ এক প্রকার ঝট করে আমার মুখের দিকে তাকালো। আমি মুচকি হাসলাম। মৃদু চাঁদের আলোতে দেখতে পেলাম তার চোখে মুখে গুরুতর আতঙ্কের ছাপ!

মাতৃত্ব বনাম অধ্যয়ন : এক অনন্য অভিজ্ঞতা

জান্নাতুল ফেরদৌস ইতি
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব সোশিওলজি

মাতৃত্ব নাকি অধ্যয়ন? এই দ্বিধার সামনে দাঁড়িয়ে, যেকোনো একটিকে বেছে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া হয়তো সহজ, কিন্তু দু'টি লক্ষ্যকে একসঙ্গে ধারণ করে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া সত্যিই কঠিন। জীবনের এই জটিল সমীকরণে একজন শিক্ষার্থী হিসেবে নিজেকে আত্মবিশ্বাসী হিসেবেই চিনেছি। গতবছর আমি মাতৃত্বের পরিচয় লাভ করি। জন্মের আটদিন পর তার সাথে আমার প্রথম আলিঙ্গনে মাতৃত্বের স্নেহমাখা মধুর অনুভূতিকে স্পর্শ করার সৌভাগ্য হয়। হাঁটি হাঁটি পা পা করে মাতৃত্বের ৩৬৫ দিনের দ্বারপ্রান্তে চলে এসেছি। এই অবস্থানে দাঁড়িয়ে প্রতিটি মুহূর্তের সংগ্রাম আর অভিজ্ঞতাগুলো লিখে সত্যিকারের অনুভূতি ফুটিয়ে তোলা একটু কঠিন। তাই এই যাত্রার একটি মাসের অভিজ্ঞতা তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি যেখানে আমাদের দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিকও প্রতিফলিত হবে।

সময়টা তার পঞ্চম মাস। হঠাৎ লক্ষ করি সে খুব দ্রুত নিঃশ্বাস নিচ্ছে। হাসপাতালে নেওয়ার পর ডাক্তার প্রাথমিকভাবে এক সপ্তাহ নেবুলাইজ করতে বললেন। কিন্তু না, নেবুলাইজ করার পরও নিঃশ্বাস তার আগের গতিতেই চলমান। তারপর ডাক্তার এ অবস্থা দেখে ইমার্জেন্সি ভর্তি করতে বললেন। হঠাৎ করে মনে হলো আমার শরীরের দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে, কারণ ভাবতেই পারছিলাম না কালকের প্রেজেন্টেশনটা কীভাবে দিবো! কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করলাম। পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে তাকে আরো পাঁচ ধরনের টেস্ট দেয়া হলো, যার মধ্যে চারটি ছিলো ব্লাড টেস্ট। ব্লাড টেস্টের জন্য চারটি টিউব নিয়ে আসলাম। তিন থেকে চারবার বলার পর নার্স আসলো ব্লাড নিতে। চারটি টিউব এ পরিমাণমতো ব্লাড নিতে ওই ছোট মানুষটার ৬ জায়গায় ইনজেকশন পুশ করলো। সবচেয়ে কষ্টের বিষয় হলো ওই মুহূর্তে সন্তানের হাত পা ধরে বসে ছিলাম আমি আর সেই অনুভূতি কোনো কিছু দিয়ে প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অতঃপর নিজেকে সামলে নিয়ে টিউবগুলো ল্যাবে জমা দিতে যাই। তিনটা টিউব জমা দিয়ে আসার পর যখন চার নম্বর টিউব জমা দিবো তখন ল্যাবের লোকটি বললো 'এই ব্লাড বাতিল কারণ টিউবে নেয়ার পর নিশ্চয়ই এটা ঝাঁকানো হয়েছে আর তাই এটা জমাট বেঁধে গেছে। জমাট বাঁধা রক্ত দিয়ে এই টেস্ট হয় না।' আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। শুধু সৃষ্টিকর্তাকে বলতে লাগলাম 'তুমি যাকে বেশি ভালোবাসো তাকেই এত পরীক্ষা দাও কিন্তু তোমার এই বান্দার যে আর ভালোবাসা বহনের শক্তি নেই, নিজের চোখের সামনে সন্তানের এই কষ্ট যে আর দেখতে পারছে না।' তারপর অনেক কষ্টে আবার বেড এ আসলাম এবং নার্সদের গিয়ে বললাম,

-কেন করলেন এমন? আপনারা তো ট্রেনিংপ্রাপ্ত এবং এটা খুব ভালো করে জানেন যে জমাট বাঁধা রক্ত দিয়ে এই টেস্ট হয় না। তাহলে কেন ওইভাবে টিউবটা ঝাঁকালেন?

: টিউবে একটা মেডিসিন থাকে যেটা ব্লাডকে জমাট বাঁধতে দেয় না, এমনকি ঝাঁকালেও না।
-তাহলে জমাট বাঁধলো কীভাবে?
: হয়তো টিউবে সমস্যা ছিলো।
তারপর আম্মু পুনরায় আরেকটা টিউব নিয়ে আসলো এবং আমার সন্তানকে সপ্তমবারের মতো ইনজেকশন পুশ করা হলো। না

এখানেই শেষ না। এই ব্লাডও ল্যাব থেকে বাতিল বলে ঘোষণা করলো এবং আরেকটি নতুন টিউব দিয়ে বললেন, 'কোনোভাবেই ঝাঁকাবেন না।' কিন্তু আমি অষ্টমবারের মতো সন্তানকে ইনজেকশন পুশ করার অনুমতি দিতে ব্যর্থ হলাম। তখন তার বাবার সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিই যে এই টেস্ট বাইরে অন্য বেসরকারি হাসপাতাল থেকে করাবো। এবং মজার বিষয় হলো ঐ বেসরকারি হাসপাতালে একবারেই ব্লাড নিতে পারলো, যেখানে দেশের মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে সাতবারের চেষ্টায়ও পারলো না।

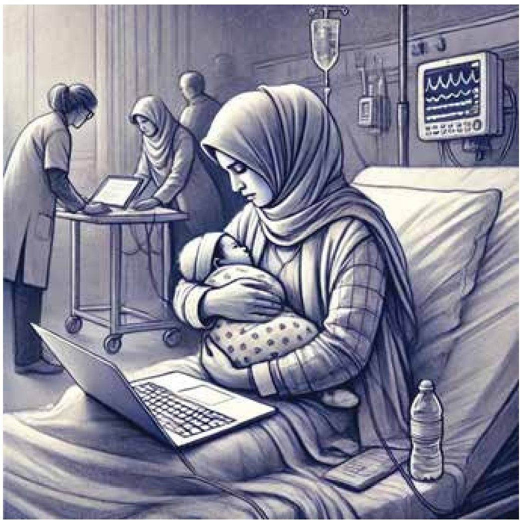

সারাদিনের এই টেস্ট সেই টেস্ট নিয়ে দৌড়ঝাঁপের পর তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাত ১ টার দিকে যখন একরাশ ক্লান্তি নিয়ে নিদ্রাচ্ছন্ন চোখে নিজের অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে বসলাম ঠিক তখন জানালার বাইরের লালাভ আলোক বিচ্ছুরণ চোখে পড়লো। প্রথমে ভেবেছিলাম ক্লান্ত চোখের বিভ্রম কিন্তু পরক্ষণেই নাকে ইলেক্ট্রিক তার পোড়া গন্ধ আসলে জানালার কাছে গিয়ে বাইরের পাশটা দেখার চেষ্টা করি। বাইরে তাকাতেই যা দেখলাম তার জন্য দেহ মন কোনোটাই প্রস্তুত ছিলো না। দেখতে পেলাম আমরা যেই ভবনে ছিলাম সেই ভবনের তৃতীয় তলার একটি এসিতে আগুন জ্বলছে। তৎক্ষণাৎ আম্মু এবং তাকে নিয়ে নিচে নেমে এলাম। দেখতে পেলাম ইতোমধ্যে অনেক রোগীই নেমে গিয়েছে এবং আরো রোগী নামছে... এদের মধ্যে অনেক রোগীকেই কোলে করে নামানো হয়েছে, আবার কাউকে তো অক্সিজেন সিলিন্ডারসহ নামানো হয়েছে। এইসব দৃশ্য দেখে শুধু মনে হচ্ছিল এত বড় হাসপাতালে এই ধরনের দুর্ঘটনা! তাও আবার রোগীদের জানানোরও প্রয়োজন মনে করে না! কী হতো যদি আরো আগেই ঘুমিয়ে যেতাম! এত কিছুর পরও ঠিক সকালবেলা সন্তানের সবকিছু গুছিয়ে শাহবাগ থেকে ভার্সিটির ৬টা ৫০ মিনিটের বাস ধরলাম।

একদিন ঠিক রাত ২ টার দিকে তার কান্নায় ঘুম ভাঙে। কোলে নিতেই দেখি জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। নার্সকে ডাকলাম কিন্তু নার্স ঘুম ঘুম চোখে বললেন,

-কি হয়েছে?
: দয়া করে একটু ডিউটি ডাক্তারকে বলুন রোগীর গায়ে ১০৩ ডিগ্রি জ্বর, কী করবো?
-সামান্য জ্বরের জন্য ডিউটি ডাক্তারকে ফোন দেয়া যাবে না, নাপা সিরাপ খাইয়ে দিন।
: আমাকে বলা হয়েছে আমার সন্তানের চলমান মেডিসিনের প্রতিক্রিয়াতে জ্বর আসতে পারে। ওর যেহেতু এত হাই পাওয়ারের ওষুধ চলছে সেহেতু নাপা খাওয়ানো যাবে কিনা এটা দয়া করে ডাক্তারের কাছ থেকে নিশ্চিত হয়ে নিন।
-না এখন ফোন দেয়া যাবে না।

অবশেষে সেই জ্বর নিয়েই তাকে পুরো রাত কাটাতে হলো। আর সেই অবস্থায় সন্তানকে রেখে একজন মায়ের ক্লাসে উপস্থিত হওয়া কখনোই সম্ভব না।

কিছুদিন আগে যখন ফিল্ড ট্রিপের জন্য কুমিল্লা বার্ড-এ যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয় তখন থেকেই শুরু হলো এক মানসিক চাপ। বুঝতেই পারছিলাম না, আদৌ স্টুডেন্ট মাদাররা যাওয়ার অনুমতি পাবে কিনা!!!!! অনেক দ্বিধাদন্দ্বের পর কোর্স-টিচার আশ্বস্ত করলেন আমরা যেতে পারবো। সেখানে পৌঁছানোর পরই যে অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলাম তার জন্য আমি একদমই প্রস্তুত ছিলাম না। মেয়েদের হোস্টেলে যাওয়ার পর শুনতে পারলাম আমরা যারা স্টুডেন্ট মাদার আছি তাদের সাথে অন্য মেয়েরা রুম শেয়ার করতে চায় না, আমরা থাকলে তাদের রিসার্চ এর ক্ষতি হবে। তাদের দাবি আমরা নাকি অতিরিক্ত সুবিধা পাচ্ছি। বুঝতে পারলাম, যে সমাজে মেয়েরাই মেয়েদের পরিস্থিতি বোঝে না সে সমাজের তথাকথিত "উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট" এর বুলি আওড়ানো সময় অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

মাতৃত্বের এই টানাপোড়েনে সবচেয়ে কষ্টের বিষয় হয়ে দাঁড়ায় পড়াশোনা বন্ধের জন্য সামাজিক চাপ। আশেপাশের সবাই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে পড়াশোনা বন্ধের পরামর্শ দিচ্ছিলো। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো তার কিছুদিন আগেই যখন আমি আমার সন্তানকে নিয়ে ভার্সিটি গিয়েছিলাম তখন আমার এক শিক্ষিকাই (অন্য বিভাগের) আমাকে বলেছিলেন 'এই ছোট

বাচ্চাকে নিয়ে ভার্সিটি আসার কী দরকার?...এত পড়ে কী দুনিয়া উদ্ধার করবা?...এই ছোট বাচ্চাকে নিয়ে উনি আসছে সোশিওলজি পড়তে....যাও বাসায় যাও...একটা সেমিস্টার ড্রপ দিলে কী হবে!' হ্যাঁ তিনি আমার সন্তানের ভালোর জন্য কথাগুলো বলেছেন কিন্তু তিনি এটা একবারও চিন্তা করেননি এটা আমার মনোবলকে দুর্বল করে দেবে...আর সেটাই হয়েছিল আমি তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নেই সেমিস্টার ড্রপ দেবো। আর ঠিক তখন আমার হারিয়ে যাওয়া মনোবল ফিরিয়ে আনলো একজন পুরুষ, আমার সন্তানের পিতা। সেদিনের পর থেকে আর কোনোদিন আমার মনোবল ভাঙেনি। যে যাই বলুক আমি আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিনি।

আগেই বলেছিলাম মাতৃত্বের এবং অধ্যয়নের টানাপোড়েনের সকল সংগ্রাম, বিষাদ, অসহায়ত্ব লিখিত আকারে প্রকাশ করা কঠিন। আমি লিখতে পারবো সেইদিন হাসপাতালে বসেও অনলাইনে এক্টিভলি ক্লাস করেছিলাম, হাসপাতালে বসেই টার্ম পেপারের কাজ করেছিলাম এবং নিয়েছিলাম ক্লাস টেস্টের প্রস্তুতিও। কিন্তু এটা লিখতে পারবো না এর জন্য আমাকে কতটা প্রেসার নিতে হয়েছে, লিখতে পারবো না কীভাবে সকালে সন্তানের সবকিছু প্রস্তুত করে দৌড়ে দৌড়ে শাহবাগ থেকে মিরপুর সেনানিবাসে গিয়ে ক্লাস করেছি। এটা লিখে বোঝানো সম্ভব না ক্লাসে ঢুকলেই যখন সবাই সন্তানের কথা জিজ্ঞেস করতো তখন কেমন লাগতো, ক্লাস শেষ করে প্রিয় বান্ধবীকে অনেক কথা বলার থাকলেও সেসব কিছু ফেলে কীভাবে আবার দৌড়ে দৌড়ে সন্তানের কাছে ফিরে আসতাম। প্রতিদিন রিলিজের আশায় থেকে একমাস ধরে যখন প্রতিদিন শুনতাম যে আজকে রিলিজ হবে না সেই মুহূর্তের অনুভূতি আমি কীভাবে প্রকাশ করবো! সেই অনুভূতিই বা কীভাবো লিখবো একটা ক্লাস মিস গেলে আমার কেমন লাগতো, যেই আমি অনার্স লাইফে কোনোদিন ক্লাস মিস দেইনি। আর ওই যে ওই অনুভূতির কী হবে যেদিন ডাক্তার বলেছিলেন 'আপনার সন্তানকে আইসিইউতে রাখতে হবে' এবং সেটা মাথায় নিয়েই পরেরদিন প্রেজেন্টেশন দেয়ার যে ব্যাপারটা!

দিন শেষে আমি যেমন একজন মা তেমনি একজন শিক্ষার্থী। তাই আমার নিজের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় রেখেই কাজ করতে হয়। সকল হতাশা দূর হয়ে যায় যখন দেখি এত সংগ্রামের মধ্যেও আমি সর্বোচ্চ সিজিপিএপ্রাপ্তদের একজন। ভার্সিটি থেকে ফেরার পর আমার সব ক্লান্তি আর অবসাদ হারিয়ে যায় যখন আমার সন্তান আমার কণ্ঠ শুনেই খুশিতে নাচতে থাকে, মায়ের ঘর্মাক্ত শরীরকে জাপটে ধরে। সন্তান একদিন বড় হবে, পড়াশোনাও শেষ হবে... রয়ে যাবে শুধু আমার এই যুদ্ধক্ষেত্রের স্মৃতিগুলো...।

মেঘে ঢাকা ভোর

এস এম নাজিব উল আলম
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি

এ জগতে পিকুর দিদিমা ছাড়া আর কেউ নেই। পিকুর দিদিমারও এই একমাত্র নাতি ছাড়া কেউ নেই। পিকুর দিদিমাই হলো একমাত্র বন্ধু। তার হাসি কান্না, ভালো লাগা, না লাগা সবই দিদিমাকে ঘিরে। পিকুর এমন কপাল–দুধ খাওয়া বয়সে সড়ক দুর্ঘটনায় মা-বাবাকে হারিয়েছে। সেই দুর্ঘটনায় পিকু কী করে যে বেঁচে গেল; সেটাই সবাই অবাক মানে। তার একমাত্র সন্তান ও সন্তানের বউকে হারিয়ে এই একমাত্র নাতিকে নিয়ে বেঁচে থাকার সান্ত্বনা খুঁজে দিদিমা। পিকুর বয়স এখন বছর ছয়েক হবে। ক্লাস টু তে পড়ে। এ বয়সে একটা বাচ্চা যে ধরনের চালাক চতুর হয়ে থাকে, পিকুর মাঝে তা দেখা যায় না। বাইরের জগতে সে অনেকটা আড়ষ্ট, জবুথবু হয়ে থাকে। কী যেন ভয় তাকে সবসময় তাড়া করে বেড়ায়। তার আশেপাশের মানুষগুলোর কথাবার্তা চলাফেরা পিকুর একদম ভাল লাগে না। মানুষগুলোকে দেখলে কেমন যেন ভয় ভয় করে। তার ক্লাসের মোটা দুলাল তাকে প্রতিদিন টেনে এনে তার পাশে বসাবেই। এটা করবি না, ওটা করবি না বলে শাসাতে থাকে। দুলাল যখন বলে 'এই তুই আমার কথা না শুনলে টিচারকে তোর বিরুদ্ধে মিথ্যা বলে মার খাওয়াবো', পিকু তখন চুপসে যায়। দিদিমা প্রতিদিন টিফিন বক্সে করে টিফিন দেয়। দুলাল এবং আরও কয়েকজন মিলে ঐ টিফিনের প্রায় সবটাই খেয়ে ফেলে। পিকু কিছুই বলতে পারে না ভয়ে। ক্লাস টিচার শীলা ম্যামকে কে যেন বলে দিয়েছিল দুলাল পিকুর টিফিন খেয়ে ফেলে। শীলা ম্যাম এসে দুলালকে বকাঝকাও করেছিল। তাতেও দুলাল দমে নাই। পিকুর পেছনে দুলাল সবসময় লেগেই থাকে। তবে কিছু কিছু মানুষকে পিকুর ভাল লাগে। স্কুলের শীলা ম্যাম, হেডমিস্ট্রেস ম্যামকে দেখলে পিকুর ভয় ভয় ভাবটা কেটে যায়। শীলা ম্যাম মাঝে মধ্যে টিফিন পিরিয়ডে পিকুকে ডেকে নিয়ে যায়। 'কিরে পিকু, দুলাল তোর টিফিন খেয়ে ফেলেছেতো। এদিকে আয়'- বলেই ম্যাম এটা ওটা খেতে দেয়। আর আদর করে বলে, 'পিকু, বোকাসোকা হওয়া চলবে নারে।' হেডমিস্ট্রেস ম্যাম প্রতিদিন ক্লাস ভিজিটে এসে পিকুর কাছে আসবেই, পিকুর চুলগুলো বিলি কেটে দিয়ে বলবে- 'পিকু, মুখটা শুকনো কেন? মন খারাপ? মন খারাপ হলে আমার কাছে চলে আসবে-কেমন।' পিকু মাথা নাড়ে। পিকুর তখন মনে হয় 'মায়েরা বোধ হয় এমনই হয়।' পিকুর বুকের ভেতর হঠাৎ করে একরাশ শূন্যতা নেমে আসে। ভেতরে ভেতরে কেমন যেন কান্না উথলে উঠে।

বাসায় দিদিমার কাছে একটা লোক আসে। লোকটাকে দেখলে পিকুর খুব ভয় পায়। পিকু তখন ভয়ে জড়সড় হয়ে যায়। লোকটা দিদিমার সঙ্গে রেগে রেগে কথা বলে। পিকুর দিকে কেমন করে যেন তাকায়। যেন এখনি মারতে আসবে। লোকটা চলে গেলে পিকু দিদিমার বুকে মুখ লুকায়। দিদিমা বলে–'পিকুরে ঐ বর্ণচোরা আমার মায়ের পেটের ভাই ও আমার সব সম্পত্তি, টাকাপয়সা আত্মসাৎ করতে চায়। তোকে এতিমখানায় পাঠিয়ে আপদ বিদায় করতে চায়। পিকু আমি মরে গেলে তুই অনেক দূরে পালিয়ে যাবি, ও তোকে বাঁচতে দেবে না পিকু'–বলতে বলতে দিদিমা পিকুকে আরও জোরে বুকে জড়িয়ে ধরে বিলাপ করতে থাকে। পিকু এসব মরে-টরে যাওয়া বুঝে না। পিকু বুঝে-এ জগতে দিদিমাই হলো তার সব, দিদিমা ছাড়া তার এক মুহূর্ত চলবে না। স্কুল থেকে আসলে দিদিমা তাকে যত্ন করে গোসল করাবে, সামনে বসিয়ে ভাত খাইয়ে দেবে। সন্ধ্যায় পড়তে বসাবে। পড়া শেষে গল্প বলতে বলতে ঘুম পাড়াবে। দিদিমার গল্পটা খুব মজার। মাঝে মাঝে এমন সব গল্প বলে হাসতে হাসতে পিকুর পেটে খিল ধরে যায়। কখনো কখনো হাসতে হাসতে দিদিমার বুকে লুটোপুটি খায়। সেদিন দিদিমা বলছিল 'পিকু, শরীরটা ভাল লাগছে না। কেমন যেন মাথা ঘুরছে। একটু ডাক্তারের কাছে যেতে পারলে ভালো হতো। আয় তোকে খাইয়ে দিয়ে একটু তাড়াতাড়ি ঘুমাবো।' পিকু শান্ত ছেলের মতো খেয়ে নিল। দিদিমা আজ গল্প বললোনা। পিকুও চুপচাপ দিদিমার বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। সকালে ঘুম ভাঙলে পিকু দেখে, দিদিমা তখনও শুয়ে আছে।

পিকুর অবাক লাগলো। দিদিমাতো এমন করে না। সেই ভোরেই উঠে যায়। পিকুর জন্য নাস্তা তৈরি করে। ব্যাগে বই খাতা গুছিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে ডাকতে থাকে ‘পিকু উঠ দাদু, উঠ স্কুলের দেরি হয়ে যাচ্ছে যে।’ সেই দিদিমা এখনও উঠছে না, পিকু দিদিমাকে এবার ধাক্কা দিতে লাগলো। ও দিদিমা উঠো না, উঠো না, স্কুলের দেরি হয়ে যাচ্ছে। পিকু এবার দিদিমাকে আরও জোরে জোরে ঝাঁকুনি দিতে লাগল। দিদিমার তাতেও ঘুম ভাঙছে না। পিকু এবার বিরক্ত হলো। বিছানা থেকে নেমে আপন মনে বলতে লাগল- ‘স্কুলের টিচার বকা দিলে তোমার কথা বলবো। তুমি ঘুম থেকে উঠছো না বলেই আমার ঠিক সময় স্কুলে যাওয়া হচ্ছে না।’ পিকু এরপর একটা টুলের উপর দাঁড়িয়ে জানলাটা খুললো। পুরো আকাশটা ফ্যাকাসে মেঘে ঢেকে গেছে। কাঁঠাল গাছটার ডালে বসে একটা কাক বিশ্রী কর্কশ গলায় ডেকেই যাচ্ছে। হঠাৎ পিকু যেন দিদিমার গলা শুনতে পেলো–‘পালা, পিকু পালা, তোকে ও বাঁচতে দেবে না, পালা।’ পিকুর শরীরটা অজানা এক ভয়ে কুঁকুড়ে গেল। পিকু দৌঁড়ে দিদিমার কাছে এল। শুয়ে থাকা দিদিমার মুখের দিকে তাকাতে পিকু অবাক হলো। দিদিমার খোলা চোখগুলো অদ্ভূত ঘোলাটে স্থির হয়ে পিকুর দিকে তাকিয়ে আছে। পিকু দিদিমাকে জোরে জড়িয়ে ধরে তীব্র আর্তনাদ করে উঠল। ‘দিদিমা আমি পালাব না, দিদিমা আমি পালাব না। উঠো দিদিমা, উঠো, আমি স্কুলে যাব দিদিমা, আমি স্কুলে যাবো।’

পিকুর আর্তনাদ ক্রমশ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে চারিদিকে তীব্র বেগে ছুটে চলল। দিদিমা তখনো স্থির, পাথর চোখে তাকিয়ে আছে পিকুর দিকে।

নিয়তি

মোস্তফা জামান কায়সার
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন ম্যানেজমেন্ট

অফিসে প্রবেশ করেই দ্রুত ঘড়ির দিকে তাকালেন এমদাদ সাহেব। ঘড়িতে তাকাতেই মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। আজকাল সময়টা একেবারেই পক্ষে কথা বলছে না তার। বারোটা বেজে গেছে। আক্ষরিক অর্থেই বারোটা বেজে গেছে তার। আজ সকাল ৯টায় অফিসের গুরুত্বপূর্ণ একটা মিটিং ছিল। ইদানীং প্রায়ই দেরি হচ্ছে এমদাদ সাহেবের। তবে আজকের দেরি হওয়ার পেছনে খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না তাকে।

অফিসে পৌঁছতে না পৌঁছতেই পিয়ন এসে হাজির, 'স্যার আপনাকে এখনই ম্যানেজার সাহেব দেখা করতে বলেছেন।' চিন্তায় পড়ে গেলেন এমদাদ সাহেব, ম্যানেজারকে কি সব বুঝিয়ে বলবেন তিনি?

অফিসের ম্যানেজার ইকরাম সাহেব। সবাই তাকে একটু গম্ভীর মেজাজের বলেই জানেন। ইকরাম সাহেবের রুমে গিয়ে কী বলবেন বারবার ভাবতে লাগলেন এমদাদ। যদিও কখনই তিনি ম্যানেজারের সঙ্গে তেমন সুবিধে করতে পেরেছেন এমন কোনো নজির নেই।

-তা বলুন এমদাদ সাহেব, শরীর ভালো তো? আজকাল তো প্রায়ই দেরি হচ্ছে অফিসে। কী হয়েছে বলুন তো আপনার?
এমদাদ সাহেব আমতা আমতা করে বললেন,
-জ্বি স্যার শরীর ভালো। শুধু ব্যথাটা একটু বেড়েছে।

-বয়স হয়েছে, বুঝতেই তো পারছেন একটু আধটু ওমন হবেই। তাছাড়া কাজেও ভুল করছেন মাঝে মাঝে। আসলে কোম্পানির হিসাব তো জানেনই, তরুণরাই আমাদের মূল চালিকাশক্তি। জুনিয়র অফিসাররাও আপনার উপর বিরক্ত। যাই হোক আমি এসব কথা আর বাড়াতে চাই না। কিন্তু আপনি প্রতিনিয়ত দেরি করছেন অফিসে। আজকের এত গুরুত্বপূর্ণ মিটিংয়েও আপনি অনুপস্থিত। এমডি স্যার আপনার খোঁজ করেও পান নি; এর কি কোনো ব্যাখ্যা আছে? আমি বলছি কী, আপনি কিছুদিন বিশ্রাম করুন, বাসায় থাকুন। আপাতত আর অফিসে আসার দরকার নেই। পরে প্রয়োজন হলে আমরা আবার আপনার সাথে যোগাযোগ করব। এই মুহূর্তে আপনাকে আসলে অফিসে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। আপনি এখন আসতে পারেন।

এমদাদ সাহেব কোনো কথা না বলে চুপ করে বেরিয়ে গেলেন।

দুপুর একটা বাজে, মাথার উপর সূর্য খিলখিল করে হাসছে! এমদাদ সাহেব বিষণ্ন মনে রাস্তায় হাঁটছেন আর ভাবছেন বাসায় কী বলবেন তিনি? দুই ছেলে-মেয়ে আর স্ত্রী ফরিদাকে নিয়ে ছোট্ট পরিবার। ছেলেমেয়েরা এখনও ছোট, এই সময়ে নতুন চাকরি খোঁজাও চাট্টিখানি কথা না। তার উপর বাজারের যা অবস্থা, এই সময়েই চাকরিটা যেতে হল?

গত ২৫ বছর ধরে গ্রিন ইন্স্যুরেন্সে চাকরি করছেন এমদাদ সাহেব। এতদিনের চাকরি এভাবে হাতছাড়া হয়ে যাবে তা ঘূর্ণাক্ষরেও আঁচ করতে পারেন নি তিনি। এখন ফরিদাকেই বা কী বলবেন? এই সবকিছুর জন্য ঠিক কাকে দায়ী করবেন? নিজেকে? নিজেকেও দায় দেয়া যাচ্ছে না সেভাবে। সকালে অফিসের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পান্থপথ যেতে না যেতেই এক এক্সিডেন্ট! কোনো এক প্রাইভেট কারের ধাক্কায় রক্তাক্ত হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে একটি মেয়ে। একগাদা লোক জটলা বেধেছে সেখানে। এমদাদ সাহেবও সাতপাঁচ না ভেবে দ্রুত সবার সাথে হাসপাতালে গেলেন। প্রচুর রক্তক্ষরণ হওয়ায় জরুরি ভিত্তিতে রক্তের প্রয়োজন মেয়েটির। রক্তের গ্রুপ মিলে যাওয়ায় দেরি না করে তিনি নিজেই রক্ত দিলেন। সবকিছু শেষ করে

আসতে আসতেই এত দেরি। ম্যানেজারকে হয়তো ঘটনাটি বলতে পারতেন, কিন্তু এমন ঘটনা ইকরাম সাহেব বিশ্বাস করবেনই বা কেন? বরং ভাবতেন, নিজের দোষ ঢাকতেই এমদাদ সাহেব এমন মিথ্যে বলছেন। সে যাই হোক আপাতত ফরিদাকে কী বলবেন সেটা নিয়ে ভাবতে লাগলেন এমদাদ সাহেব।

অফিস শেষে ইকরাম সাহেব আজ একটু দ্রুতই বাসায় ফিরলেন। প্রচন্ড উদ্বিগ্ন। দুপুরে স্ত্রী ফোন করে জানিয়েছে, প্রীতি সকালে কলেজে যাওয়ার পর এখনও আসে নি। ফোনও বন্ধ। প্রীতি ইকরাম সাহেবের একমাত্র মেয়ে। শুধু মেয়ে বললে ভুল হবে, বরং গোটা পৃথিবীটাই। ইতোমধ্যেই পুলিশের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। প্রীতির বান্ধবীদের ফোন করা হয়েছে। কিন্তু কোনোভাবেই কোনো খবর পাওয়া যায় নি। স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে একটা সময় পর ইকরাম সাহেব নিজেই কাঁদতে শুরু করলেন।

মিনিট বিশেক পর ইকরাম সাহেবের ফোনে একটি কল এলো।
-হ্যালো ইকরাম সাহেব বলছেন? সানশাইন হসপিটাল থেকে বলছিলাম। আপনার মেয়ে প্রীতি আমাদের এখানেই ভর্তি আছে; দ্রুত চলে আসুন।

দিকবিদিক ভুলে হাসপাতালে ছুটলেন ইকরাম সাহেব ও তার স্ত্রী। হাসপাতালে পৌঁছেই ডাক্তারের কাছে জানতে পারলেন, তাদের মেয়ে এক্সিডেন্ট করেছিল। একজন লোক এসে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিয়ে গেছেন। অতিরিক্ত ব্লিডিং হওয়ায় লোকটি রক্তও দিয়েছেন।

ইকরাম সাহেব প্রীতির মাথায় হাত রাখলেন। কিছুক্ষণ আগেই তার জ্ঞান ফিরেছে। প্রীতির মা মেয়ের পাশে বসে কেঁদেই চলেছে। ইকরাম সাহেব ডাক্তারকে বললেন, 'আচ্ছা, যে ভদ্রলোক আজ আমার মেয়েকে রক্ত দিলেন তাঁর এড্রেস আছে? তার সাথে যোগাযোগ করতে চাই। ডাক্তার বললেন, তিনি তো বেশি কিছু বলে যান নি। তবে হাসপাতালের রেকর্ড খাতায় নিজের নাম লিখে গিয়েছেন। ভদ্রলোকের নাম এমদাদুল হক, গ্রীন ইন্স্যুরেন্সে চাকরি করেন।

একজন অনেকজন

জান্নাতুল ফেরদৌস
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব ইকনোমিক্স

শফিক মিয়া ঘরের দুয়ারে উবু হয়ে বসে আছে। উঠান থেকে দু'কদম দূরে শেফালি মাটিতে বসে খেলছে। সে তাকিয়ে আছে শেফালির দিকে, খেলাটা বোঝার চেষ্টা করছে। অদ্ভুত খেলা, কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে মাটি তুলে ছোট্ট ছোট্ট স্তূপ মতো বানানো। এইগুলোকে পাহাড়ের আকৃতি দেওয়ার বৃথা চেষ্টাও করছে শেফালি। এই খেলার নাম কী? মাটির পাহাড় বানানোর এই খেলার একটা নাম থাকলে ভালো হতো। শফিক মিয়া তার চার বছরের ছোট্ট মেয়েটার দিক থেকে চোখ সরিয়ে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করলো। সজোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে দিয়ে মনে মনে ভাবলো, মেয়েটার জন্য কিছু খেলনা বাটি কিনতে হবে। এই বয়সী বাচ্চাদের নানারকম খেলনার শখ থাকে। পয়সার অভাবে মেয়েটার কোনো শখের দিকে খেয়াল রাখা হয় না। সে তখনই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলো, বেতন পেয়েই আগে মেয়ের জন্য একটা খেলনা বাটি সেট কিনে ফেলবে, আর মেয়ের মায়ের জন্য এক জোড়া জুতো। বাজারের মোড়ের দোকানটায় একজোড়া জুতা দেখে খুব পছন্দ হয়ে গেছে সেদিন। এটায় নাসিমা রাগ করবে, করলেও কিছু করার নেই। মেয়েলোকের বুদ্ধি ছোট, এরা সবকিছুতেই বেশি বুঝে! সবকিছুই এদের কাছে বাজে পয়সা খরচ।

গ্রামের বর্গা চাষী বাবার বড় ছেলে এই শফিক মিয়া। বাপের পেশাকে আপন করে গ্রামেই এতকাল সাদামাটা জীবনযাপন করা লোকটা হঠাৎ ঢাকা শহরের এই বস্তিতে ঠিক খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না। গ্রামের জন্য ভীষণ মন কাঁদে। তার চেয়েও বেশি খারাপ লাগে মেয়ে, বউয়ের মুখের দিকে তাকালে। মেয়েটা তার যাবতীয় সব খেলার সাথীকে হারিয়ে কেমন যেন চুপচাপ হয়ে গেছে। নাসিমার অবস্থা আরও করুণ। জলের মাছ ডাঙ্গায় যেমন ছটফট করে, নাসিমা সেরকম অস্থির সারাক্ষণ। নিজের মনের কষ্ট কাউকে বলতে পারে না। তাই কথায় কথায় রাগ ঝাড়তে থাকে, চার বছরের শেফালি মায়ের হাতে যখন তখন মা'র খেয়ে নির্বিকার ভঙ্গিতে বসে থাকে ইদানীং। মেয়েটা তার প্রয়োজনের থেকে বেশি চুপচাপ হয়ে গেছে। শফিক মিয়া গ্রামের মাতবর শাহ আলীর ঋণ শোধ করতে গিয়ে শেষ সম্বল বাপের ভিটাটাও ছেড়ে এসেছে দিন চল্লিশ আগে। এটা নিয়ে যদিও তার আফসোস নাই। ঋণ করা হয়েছিলো বোনের বিয়ে উপলক্ষে। বোন তার স্বামী সংসারে সুখেই আছে, মাশাল্লাহ্। টাকাটা ভালো কাজেই গেছে। গত শীতে ফুলতলী বাজারের ওয়াজে হুজুর বলেছিলেন, 'আত্মীয় স্বজনের জন্য কিছু করলেও আল্লাহ সওয়াব দেন, ইসলামে আত্মীয়ের সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম।' আর সেখানে সে করেছে নিজের বোনের জন্য, হোক সে সৎ বোন, বোন তো। ওই টাকার জন্য আফসোস করাটাও এখন পাপ সমতুল্য। গ্রামে এমনিতেই কাজের বড় অভাব, দিন আনে দিন খায়, এইভাবে আর কতোদিন চলতো? তাই মেয়ে, বউকে নিয়ে পাড়ি দিয়েছে এই ঢাকা শহরে। ভাগ্যের চাকা যদি ঘুরে যায়। প্রথম এক মাস যদিও খুবই দুর্বিষহ কেটেছে। কাজ পায় না, পকেটে টাকা নাই, ঠিক মতো খেয়ে না খেয়ে একটা মাস গেলো। এর মধ্যে নাসিমা কতোবার বলেছে গ্রামে ফিরে যাওয়ার কথা তার হিসেব নেই। সে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে থেকে গেছে, এই শহরে যখন উপরওয়ালা একবার এনেছেন তাহলে বাকিটাও তিনিই ব্যবস্থা করবেন, একটা গাছের পাতাও যার কথা ছাড়া নড়ে না, তিনি নিশ্চয়ই তার জন্য কিছু একটা ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

ব্যবস্থা হলো, ১০ দিন আগে সে একটা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে নাইট গার্ডের চাকরি পেয়েছে। ভালো চাকরি, মাস গেলে গোটা ১২ হাজার টাকা পাবে। এপার্টমেন্টের ম্যানেজার লোকটা একটু রগচটা হলেও মনে ভীষণ মায়া। শফিককে খুবই স্নেহ করে।

নাসিমা পাকের ঘর থেকে এসেই মেয়েকে দুইটা কিল বসিয়ে দিলো। মেয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে ফেললো, কাঁদলো না। শফিকের বড় মায়া হলো মেয়ের জন্য।

- আহ্, অরে মারতাসো ক্যান?

নাসিমা রাগান্বিত ভঙ্গিতে শফিকের দিকে একবার তাকিয়ে নিজের মনেই বিড় বিড় করতে করতে মেয়েকে নিয়ে গোসলখানার দিকে চলে গেলো। কী বিড় বিড় করলো শফিক বুঝতে পারলো না। শফিকের এবার নাসিমার জন্য মায়া হলো। বেচারির বয়স এই একমাসে মনে হচ্ছে দশ বছর বেড়ে গেছে। অভাবের সংসারে নাসিমার কোনো শখই কোনোদিন পূরণ হয়নি। তবু গ্রামে থাকতে নাসিমা এতোটা খিটখিটে ছিলো না। এই একমাসের অভাব অনটন এতোটাই চেপে বসেছিলো যে মেয়েটার এই অবস্থা। তার খুব শাড়ির শখ। বছরে একটা দুটা শাড়ি পেলেই কী যে খুশি হয়ে যায়! নাহ্, শফিক সিদ্ধান্ত নিলো বেতন পেলেই একটা শাড়ি কিনে ফেলবে নাসিমার জন্য। জুতার চেয়ে খরচটা একটু বেশি পড়বে, তা পড়ুক। টাকা পয়সা আল্লাহ দিলে হবেই।

গত রাত থেকেই জ্বরে ভুগছে নাসিমা। তবু এই ভরদুপুরে রান্না না করে উপায় নাই। রান্নাঘর, গোসলখানা সবই তাদের ভাগাভাগি করে ব্যবহার করতে হয়। রান্নার সময় ভাগ করা আছে, এর বাইরে গেলে আবার চুলা খালি পাবে না। কিছু না হোক বাড়িতে নিজেদের একটা ছোট্ট পুকুর ছিলো, একটা পাকের ঘর ছিলো। গোয়ালে একটা গাই গরু ছিলো। মেয়েটাকে মাঝে মধ্যে একটু খানিক গরুর দুধ খাওয়াতে পারতো। এখানে আসার পর থেকে দুইবেলা খাওয়াই জুটাতে পারে নাই ঠিকমতো, আর মেয়েকে ভালোমন্দ কী খাওয়াবে। লোকটার উদারতার ফল এখন সে আর তার মেয়ে ভোগ করছে। বোনের বিয়ে দিতে গিয়ে নিজের শেষ সম্বলটাও ছেড়ে দিলো। গরীব মানুষের এতো 'হাতেম তাঈ'গীরি ভালো না। এসব ভাবতে ভাবতেই চোখের কোণে পানি জমে উঠলো নাসিমার। চিন্তায় ছেদ পড়লো স্বামীর ডাকে,

–বউ, ও বউ। জ্বরটা কি কমছে? ওষুধ পাতি কিছু আইনা দিয়া যাই?
নাসিমা চুপ করে রইলো, কিছু বললো না। শফিক আবার বললো,
–কী হইসে? কথা কও না ক্যান?
–আমার এই অবস্থায় আইজকাও আপনি কাজে যাইবেন? শরীর বেশি খারাপ হইলে একলা মাইয়াডারে নিয়া আমি কী করমু?
–নয়া চাকরি, এমনে কামাইও তো দেওন যায় না। তুমি এইদিকে আহো, জ্বরটা দেহি, জ্বর বেশি হইলে ওষুধ আইনা দিয়া যামু।
লাগবো না।

হঠাৎ শফিকের বাটন ফোনটা কর্কশ শব্দ করে বেজে উঠল। ম্যানেজারের ফোন। শফিক ফোনে কথা বলছে, নাসিমা শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো তার দিকে। লোকটার উপর তার রাগ দিনে দিনে বাড়ছেই শুধু। ফোনে কথা শেষে শফিক নিজ থেকেই বললো,

–রাস্তায় নাকি ঝামেলা হইতাসে। ছাত্ররা আন্দোলন করতাসে 'ছাত্ররা করবে পড়ালেখা, এরা আন্দোলন করবে ক্যান?'
–ম্যানেজার কি কইলো?
–বলসে গ্যাঞ্জাম দেখলে আইজকা যাওন লাগবো না। আশেপাশের অবস্থা দেইখা তারপর যাইতে কইসে।
–তুমি কী কইলা?

শফিক অবাক হয়ে বললো, কী কমু? কইসি রাস্তার অবস্থা দেইখা চইল্লা আসমু আল্লাহর নাম নিয়া। বুঝলা বউ, শহরে তো নতুন আইলা, এইহানে সবই এইরহম। গ্যাঞ্জাম আর গ্যাঞ্জাম। আইজ এই গ্যাঞ্জাম তো কাইল আরেক গ্যাঞ্জাম। আমি রাস্তার থেইকা একটু দেইখা আসি, সাথে তোমার ওষুধপাতিও কিছু নিয়া আসুম।

–গ্যাঞ্জামের মধ্যে যাওনের দরকার কী?

–শহরের মাইনষের নিত্যদিনের ব্যাপার এইডা। শহরে থাকতাসো, সেইরহম চলতে হইবো। তুমি আমার রাইতের খাওনডা বাইরা রাইখো। আমি তোমার ওষুধটা নিয়া আসি।

অন্যদিনের চাইতে চারদিক অস্বাভাবিক রকমের শান্ত। বস্তি থেকে বের হলেই গলির ভেতর কয়েকটা দোকান পড়ে। দোকানগুলোয় আজ খদ্দের নেই বললেই চলে। বড় রাস্তার মোড়ে গিয়ে দেখলো দোকানপাট সব বন্ধ। মাঝে মাঝে দু'একটা গাড়ি চলছে। ঢাকা শহরে গ্যাঞ্জাম প্রথম দেখলো শফিক। এইরকমই বোধহয় হয়, অতিরিক্ত সাবধানতায় নির্জন নগরীতে পরিণত হয় এই যন্ত্রের শহর। এরকম নিরিবিলি রাস্তা দেখে ভালোই লাগছে তার। সে সামনের দিকে হাঁটতে লাগলো।

বড় রাস্তার পাশের দোকানগুলো বন্ধ, ওষুধ কিনতে গলির দোকানগুলোয় খুঁজতে হবে। বেশ খোঁজাখুঁজির পর একটা গলির একদম ভেতরের দিকে একটা বাজার মতোন পেলো। এখানে ওষুধের দোকান খোলা আছে। সে ওষুধ নিয়ে আবার মূল রাস্তার দিকে হাটা দিলো। তার ইচ্ছা করছে এরকম শান্ত রাস্তায় মেয়েটাকে নিয়ে একটু বেরিয়ে আসতে। মেয়েটাকে এখনো ঠিকমতো ঢাকা শহর দেখানো হলো না। চিন্তা করে রাখলো মেয়ে, মেয়ের মা'কে নিয়ে একদিন ঘুরতে বের হবে। বেতনটা আগে পাক। আজকের পরিবেশ সুন্দর, আজকে যেতে পারলেই ভালো হতো। পাশের ঘরের রাসেলের বাপের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করা যেতে পারতো, কিন্তু সময় নাই। তার কাজে যেতে হবে, গোসল, খাওয়া কিছুই হয়নি। বেলা বাজে চারটা। মূল রাস্তায় উঠে দেখলো রাস্তার চেহারা পুরো বদলে গেছে। অল্পবয়সী অনেকগুলো ছেলে মেয়ে রাস্তায়। এদের সাজপোশাক কেমন যেন আলাদা। কেউ কেউ কপালে পতাকা বেধে রেখেছে। এরা কী যেন স্লোগান দিচ্ছে! শফিক দাঁড়িয়ে গেলো। তার এই পরিবেশটাও ভালো লাগছে, শরীরে কেমন জোশ অনুভব করছে সে। স্লোগানটা শোনার চেষ্টা করলো।

'মেধা না কোটা? মেধা, মেধা।'

শফিক ভাবলো সেও একটু গলা মেলাবো কি না। যদিও এই বিষয় নিয়ে তার কোনো ধারণাই নাই। তাই বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা ঠিক হবে কি না। নিজের অজান্তেই স্লোগানটা দুইবার বিড় বিড় করলো সে। হঠাৎ কী হলো বুঝতে পারলো না। কাছে কোথাও খুব জোরে শব্দ হলো। সে দেখলো বিশাল মিছিলটা কেমন যেন ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো। যে যেদিকে পারছে দৌড়াচ্ছে। কিছু না বুঝেই শফিক দৌড়াতে শুরু করলো। চোখ জ্বালা করছে খুব, চোখে ঝাপসা দেখছে সে। সাথে কেমন যেন একটা গন্ধ, নাক মুখ জ্বলছে এখন, নিঃশ্বাসে কষ্ট হচ্ছে। শফিক ঠিকমতো দৌড়াতে পারছে না, সকালে চারটা ভাত খেয়েছিলো, এরপর থেকে পেটে কিছু পড়েনি। মানুষের ধাক্কায় অবস্থা বেহাল তার। সে কিছুটা পিছিয়ে পড়লো। হঠাৎ জোরে একটা শব্দ হলো। সে নিজের মধ্যে কোনো একটা পরিবর্তন অনুভব করছে। শফিকের পুরো শরীর অবশ হয়ে আসছে, সে আর দৌড়াতে পারছে না। এক হাঁটু ভাঁজ করে মাটিতে বসে পড়লো সে। নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলো পিচগলা কয়লা রঙের রাস্তাটা লাল হয়ে গেছে। রক্তের লাল, এটা যে তারই রক্ত তা বুঝতে কয়েক সেকেন্ড সময় লেগে গেলো তার। পেটের কাছটায় অসহ্য ব্যথা অনুভব করছে। মাটিতে লুটিয়ে পড়লো শফিক। হাত থেকে ওষুধের ঠোঙাটা পড়ে গেলো। চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে আরো বেশি। সে চোখ খোলা রাখতে পারছে না আর, আপ্রাণ চেষ্টা করছে চোখ খোলার রাখার, কী হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছে না। চোখ ভয়ঙ্কর জ্বালা করছে, সাথে পেটের কাছটা ব্যথায় অবশ হয়ে আসছে। চোখ বন্ধের আগে সে সবুজ রঙের কিছু একটা দেখলো। শফিকের মনে হলো নাসিমার শাড়িটা হতে হবে সবুজ রঙের, একদম এই ধরনের পতাকা সবুজ। নাসিমার খুব পছন্দের রঙ এটা। মেয়েটার কথা মনে পড়লো। মেয়েটাকে নিয়ে বেড়াতে বের হওয়া হলো না, আর মেয়েটার খেলনা বাটি?

তাপদাহ এবং বৃক্ষরোপণ

ইমতিয়াজ আহমেদ
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স

তীব্র তাপপ্রবাহে শুধুই কী বৃক্ষরোপণ?

পৃথিবীর মানচিত্রে ছোট একটি দেশ বাংলাদেশ। আয়তনে বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় নিতান্তই তুলনামূলক না হলেও, এমন অনেক আন্তর্জাতিক সূচকই বিদ্যমান যেখানে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম সারির দিকে। এর মধ্যে অন্যতম হলো জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব।

প্রাকৃতিক এবং মানবসৃষ্ট দুর্যোগপ্রবণ দেশগুলোর তালিকার মধ্যে বাংলাদেশের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বন্যা, খরা, সাইক্লোন, ভূমিধস, অগ্নিকাণ্ডসহ প্রায় সব ধরনের দুর্যোগের দেখা মিলে বছরজুড়ে।

দুর্যোগের পাশাপাশি বৈশ্বিক উষ্ণায়ন সকলের জন্য চিন্তার এক কারণ। দুর্যোগ সংঘটিত হওয়ার প্রবণতা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বৃদ্ধির সাথে প্রায় সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিবছর তাপমাত্রা আগের বছরকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। দেশজুড়ে সৃষ্টি হচ্ছে প্রবল তাপদাহ, যা জনজীবনকে স্থবির করে রাখছে। শুধু প্রাকৃতিক দুর্যোগই নয়, পাশাপাশি উদ্ভব হচ্ছে নানাবিধ সংক্রামক ব্যাধি।

এই বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও তাপদাহের পেছনে প্রধান কারণ হলো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউজ গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি। বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য গ্যাস হলো : কার্বন ডাইঅক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, মিথেন, সিএফসি, জলীয়বাষ্প ইত্যাদি।

বর্তমানে অধিকাংশ মানুষ মনে করেন বৃক্ষরোপণই এই তাপদাহের একমাত্র সমাধান। তাই গ্রীষ্মের তীব্র তাপ প্রবাহের মধ্যে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি হাতে নেয়। 'গাছ লাগাও পরিবেশ বাঁচাও' স্লোগান নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে মানুষ। সমস্যা হচ্ছে কোনোরকম নিয়ম না মেনে এই গ্রীষ্মের সময় গাছ লাগিয়ে দিলেই তো আর সেই গাছ হবে না। সুষ্ঠুভাবে গাছ লাগানো কর্মসূচির বাস্তবায়নে প্রয়োজন সঠিক সময় বর্ষা মৌসুম এবং রোপিত গাছগুলোর সঠিক পরিচর্যা। কিন্তু সারা বছর এসব নিয়ে কেউ চিন্তা করে না। বেশি-বেশি গাছ লাগানোর পাশাপাশি যে গাছ লাগানো কর্মসূচি থেকে বনাঞ্চল রক্ষা করা বেশি জরুরি, এটা নিয়ে সাধারণ মানুষের সচেতনতার অভাব এবং আগ্রহে অনীহা প্রকাশ পায়।

এ-তো গেলো গাছের কথা। এবার বলি আমাদের সৃষ্ট বর্জ্য, ব্যবহৃত প্লাস্টিকের বিষয়ে, যা পরিবেশ দূষণের পাশাপাশি মিথেন গ্যাস উৎপন্ন করায়ও ভূমিকা রাখে। এ সকল প্লাস্টিক বর্জ্য থেকে উৎপাদিত মিথেনের পরিমাণ, গ্রিনহাউস গ্যাসের উৎসের মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তর। এভাবে চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে সমুদ্রে মাছের চেয়ে প্লাস্টিকের সংখ্যা বেশি হবে বলে আশঙ্কা করেন বিজ্ঞানীরা।

ফলে এমন অবস্থায় এই বৈশ্বিক উষ্ণায়ন থেকে রক্ষা পেতে সকলকে সচেতন হতে হবে। শুধু বৃক্ষরোপণের নামে অপরিকল্পিত গাছ লাগানো নয় বরং নিয়ম মেনে সুষ্ঠুভাবে বৃক্ষরোপণ করতে হবে। পাশাপাশি বনজ সম্পদ রক্ষায় সকলকে সচেতন হতে হবে। অন্যথায় আগামী বছরগুলোতে এই তাপদাহের সমাধান হবে না, বরং আরো তীব্রতর আকার ধারণ করবে।

জীবনের শিক্ষা

এস এম নাহিদ সারোয়ার সুমন
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব ল

অনার্স জীবনের শেষ পরীক্ষাটি দিয়ে অলস সময় পার করছিলো মায়মুর। ফাইনাল রেজাল্ট বের হওয়া আর মাস্টার্সে ভর্তির আগে এখন তেমন কোনো কাজ নেই তার। তাই মা খুব করে ধরলেন নানুবাড়ি ঘুরে আসার জন্যে। সেই পাঁচ বছর আগে গ্রামে গিয়েছিল সে। আজকালকার শহুরে ছেলেদের মতোই সারাদিন মোবাইল আর কম্পিউটার নিয়ে পড়ে থাকে। কোথাও বেড়িয়ে আসার কথা শুনলেই যেন গায়ে জ্বর এসে যায়। খুবই ঘরকুনো স্বভাবের। তবুও মায়ের জোরাজোরিতে এবার আর না করতে পারলো না সে। অগত্যা ঠিক হলো পরশু যাচ্ছে ও সুজানগর–ওর নানুবাড়ি।

মায়মুরের নানা বেশ সম্ভ্রান্ত লোক। দুই মামা আছে গ্রামেই জমিজিরাত দেখাশোনা করে। তবে নানা বেশ গল্পবাজ লোক। একসময় নাবিক ছিলো কিনা! ওর নানার গল্প শুনতে খারাপ লাগে না বটে–

'বলি এখন তো সব ফার্মের মুরগী হয়ে গেছিস তোরা!'–মায়মুরকে টিপ্পনি কাটে ওর নানা।
'কি যা তা বলো না নানা!'–ক্ষেপে যায় মায়মুর।
'ফার্মের মুরগী নয়তো কী, তবে তোর এক নানা ভাইয়ের কাহিনী বলি শোন, তবেই বুঝবি।'–যোগ করে ওর নানা।
'ঠিকাছে শোনাও দেখি, কী ফার্মের মুরগী হলাম আমরা।' রাগ করে মায়মুর।

বলতে শুরু করেন নানা-

'আমার বন্ধু আবিয়ান। বাপের ভালোই পয়সাপাতি ছিলো। এলাকার বন্ধু। এখনও এলাকায় ওদের বাড়ি আছে।
খাইয়ে নেয় ওরা। আর আবিয়ানের বাবাও বেশ বিচক্ষণ লোক। তিনি বিলেতি কায়দা রপ্ত করে তার পসার বেশ ভালোই জমিয়ে উঠলেন। আবিয়ান তার বড় ছেলে। বছর চারেক বাদেই ও যখন কলেজে উঠলো তার বাবা সাফ জানিয়ে দিলেন তিনি আর তার কোনো খরচ বহন করতে পারবেন না এবং এও বলে দিলেন তাদের সাথে থাকতে এবং খেতে প্রতিমাসে একহাজার পাউন্ড তার বাবাকে দিতে হবে। নইলে এ বাড়িতে তার জায়গা হবে না।

এটা শুনে তো আবিয়ান মহা ক্ষ্যাপা। কিন্তু সে তার বাবাকে ভালোমতই চিনে। তিনি যা একবার মুখ দিয়ে বলেছেন তাই করবেন।"

যা বাবা! এ কেমন বাপ। মায়মুর অবাক।
'আরে শোন না কাহিনী, তারপর কি হয়', গল্প জমিয়ে তুললেন নানা–

'বেচারার একটু কষ্টই হয়ে গেল। কলেজে তো ভর্তি করিয়ে দিয়েছেন বাবা ঠিকই কিন্তু কলেজের ফিস, হাতখরচ আবার উপরি এক হাজার পাউন্ড সে কেমনে যোগাড় করবে। অগত্যা সে কলেজ শেষে এক রেস্টুরেন্টে কাজ শুরু করলো। মাস শেষে প্রায় আড়াই হাজার পাউন্ড পেলো হাতে। বাবাকে এক হাজার পাউন্ড দিয়ে হাতে থাকলো প্রায় দেড় হাজার পাউন্ড। তা জমিয়ে কলেজের ফিস এবং হাতখরচ কোনোরকমে চলে যেতে লাগলো তার। প্রথম প্রথম ক্লাশ রেস্টুরেন্ট করে করে বেশ কষ্ট হচ্ছিল তার। তবে আস্তে আস্তে সে বেশ মানিয়ে নিলো।

এভাবে দেখতে দেখতে তার কলেজ জীবন হলো শেষ। বাবা তাঁকে ডেকে পাঠালেন। সে তো ভেতরে ভেতরে বেশ ভয়ে আছে। এবার বাড়ি ছাড়া করে কি না!

তার বাবা ডেকে বললেন, আমার স্নেহের পুত্র। তুমি তোমার কলেজ জীবনের শুরুতে আমার নেয়া সিদ্ধান্ত নিয়ে নাখোশ জানি। তবে তুমি কি কিছু ঠিক করেছো কলেজ শেষে এখন কী করবে?

সে বলল, না এখনও ঠিক করি নি।

তার বাবা বললেন, তুমি তো বেশ কয়েক বছর ধরে রেস্টুরেন্টে কাজ করছো। তো কেন তুমি নিজের একটি রেস্টুরেন্ট খুলছো না। আশা করি চার বছরে তোমার বেশ ভালো অভিজ্ঞতা হয়েছে।

তা তো হয়েছে। কিন্তু রেস্টুরেন্ট দেয়ার কথা বললেই তো আর দেয়া যায় না। টাকা পয়সারও তো একটা ব্যাপার আছে।

এটা শুনে তার বাবা হাসলেন। বললেন, প্রিয় আবিয়ান। তুমি আমাকে নিষ্ঠুর পিতা ভাবতে পারো তবে আমি তা নই। তোমার ভবিষ্যতের কথা ভেবেই আমি তোমাকে কোনো কাজ খুঁজতে বলেছিলাম এবং তুমি যে মাসে হাজার পাউন্ড আমায় দিতে তা তোমার জন্য জমিয়ে রাখতাম। এখন সময় এসেছে তা কাজে লাগানোর। অভিজ্ঞতা এবং টাকা দুটোই। তোমার দেয়া পঞ্চাশ হাজারের সাথে আমি আরও পঞ্চাশ হাজার যোগ করে এক লাখ পাউন্ড তোমায় দিচ্ছি। নিজের অভিজ্ঞতা এবং টাকা নিয়ে নিজে কিছু করো। দেখো দুনিয়ার অর্ধেক দৌঁড় তুমি দৌঁড়ে ফেলেছো। যা শিখেছো তা দিয়ে বাকি দৌঁড়টুকু দৌঁড়াতে তোমায় বেশি বেগ পেতে হবে না!

এ কথা শুনে আবিয়ান তার বাবার প্রতি শ্রদ্ধায় কেঁদে উঠলো এবং যে বাবাকে এতদিন পাষাণ ভেবে এসেছিলো তাঁকে আজ দেবতুল্য লাগা শুরু হলো।'

মায়মুর বুঝলো গল্পের শিক্ষাটা।

নানা শেষে বললেন, 'কঠিন সময় শক্ত মানুষ তৈরি করে তাই কঠিন সময়ে দমে না গিয়ে নিজেকে আরও শক্ত করার চেষ্টা করো।'

মায়মুরের মনটা নানার প্রতি শ্রদ্ধায় ভরে উঠলো।

ইন্টারনেট ও স্বশিক্ষা

রুমাইসা আহম্মেদ নাবা
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব মাস কমিউনিকেশন অ্যান্ড জার্নালিজম

প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে মোবাইল চেক করা অনেকেরই অভ্যাস। সেই সকাল থেকে শুরু, এরপর সারাদিন প্রয়োজনে, অপ্রয়োজনে সকলেই ইন্টারনেটের ব্যবহার করে থাকে। বিশেষত Gen-Z ও Gen Alpha-এই দুই জেনারেশন দিনের অধিকাংশ সময় social media, YouTube videos, OTT platform, বিভিন্ন সিরিজ, কার্টুন দেখে কাটায়। বর্তমানে শিক্ষাব্যবস্থায়ও technology ও internet এর ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে।

যেহেতু ইন্টারনেটের ব্যবহার ক্রমাগত বাড়ছে, আমাদেরও উচিত সচেতন হওয়া। আব্বু-আম্মুদের মতো মোবাইল দেখা কমাতে বলছি না। কারণ এই তথ্যপ্রযুক্তির যুগে এটা বাস্তবসম্মত সমাধান নয়। বলছি সচেতনভাবে ইন্টারনেটের ব্যবহার করা, বুঝে শুনে কোনো Content দেখার কথা।

আমরা ইন্টারনেটে কী দেখছি সেটা আমাদের নিজেদেরই কন্ট্রোল করতে হবে। কারণ আমরা যা দেখি, তার প্রতিটা বিষয়ই আমাদের unconscious mind-এ save হয়ে যায়। এই unconscious mind এবং sub-conscious mind বাস্তবতা ও স্ক্রিন-এ দেখানো ছবির মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। অথচ এই অংশ দুটো আমাদের দৈনন্দিন আচরণের ৯০% এর বেশি কন্ট্রোল করে। অর্থাৎ আমরা বিনোদন ও সময় কাটানোর জন্য যা দেখি, সেগুলোই পরবর্তীতে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহার, চিন্তা-ভাবনা, মানসিকতায় ব্যাপক প্রভাব ফেলে। আর এ কারণেই বিনোদনের নামে আমরা কী consume করছি, এটা জানা প্রয়োজন।

ইন্টারনেটের বিভিন্ন কন্টেন্ট হতে পারে আমাদের শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের পথ। এক্ষেত্রে শুধু অনলাইনে/ইউটিউবে বিভিন্ন ক্লাসই নয় বরং বিভিন্ন ব্যাখ্যামূলক ভিডিও, অডিওবুক কিংবা নাটক, সিনেমাও আমাদের জ্ঞান বাড়াতে সহায়ক হতে পারে। যেমন-ঐতিহাসিক যুদ্ধের উপর বানানো সিনেমা দেখে ইতিহাসের ধারণা পাওয়া যায়, সামাজিক সমস্যার উপর তৈরি করা নাটক দেখে সামাজিক অবস্থার ধারণা পাওয়া যায় ইত্যাদি।

আগে টিভিতে বাল্যবিবাহ, যৌতুক, এইডস এসব নিয়ে সচেতনতা তৈরি করা হতো। বই পড়ার আগে মানুষ টিভি দেখে সচেতন হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে টিভির জনপ্রিয়তা কমে যাওয়ায় মানুষ ইন্টারনেটের দিকে ঝুঁকেছে। এ অবস্থায় দরকার ব্যক্তি পর্যায়ে প্রচেষ্টা। নিজেদেরই এখন ইন্টারনেটে খুঁজে খুঁজে শিক্ষণীয়, ভালো মানের নাটক, সিনেমা, web series, YouTube videos দেখতে হবে। নিজেদেরকে স্বশিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। যেখানে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় এত ঘাটতি থাকছে, সেখানে শেখার জন্য ইন্টারনেটের কোনো বিকল্প নাই। আমাদের Generation-এ এই বিষয়ে সচেতনতা তৈরি না হলে আমরা শুধু সাক্ষর থেকে যাবো, শিক্ষিত হতে পারব না।

Gen-Z (জেন-জি)

মোঃ জুনায়দুল ইসলাম
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব মাস কমিউনিকেশন অ্যান্ড জার্নালিজম

Generation Zoomers (সংক্ষেপে জেন-জি) মানে ১৯৯৭ সাল পরবর্তী প্রজন্ম, প্রযুক্তির উন্নয়নে তথ্য প্রাপ্তি এবং যোগাযোগ ক্ষেত্রে সুবিধা পাওয়া প্রথম প্রজন্ম। এরা জন্মের পর থেকেই ইন্টারনেট সম্পর্কে ধারণা রাখে এবং এ প্রজন্ম ইন্টারনেটকে Zoom করতে অভ্যস্ত বিধায় তাদের Gen-Z বলা হয়ে থাকে।

শিক্ষাবিদরা প্রায়ই চিন্তিত ছিলেন যে এই প্রজন্ম তেমন কিছু অর্জন করতে পারবে না। তাদের অভিযোগ ছিল যে জেনারেশন জি রাজনৈতিক ইতিহাস পড়ে না, জাতীয় বীরদের নাম ঠিকভাবে মনে রাখতে পারে না, এমনকি স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবসের মধ্যে পার্থক্যও করতে পারে না। তারা ভাবতেন, এভাবে তারা কীভাবে একটি কর্তৃত্ববাদী ও দমনমূলক রাষ্ট্রের জটিল পরিস্থিতি বুঝবে এবং বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা অর্জন করবে?

এই প্রজন্ম নিয়ে আরও অভিযোগ ছিল যে তারা আওয়াজ তোলে না, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনোযোগ দেয় না, এবং সবসময় ভিডিও গেম খেলা ও দিবাস্বপ্নে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু জুলাই বিপ্লব আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে যে জেনারেশন জি আসলে কী দিয়ে তৈরি! কে জানত, ভিডিও গেমে মগ্ন এই প্রজন্মই একদিন স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এবং গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করবে, তাদের ভার্চুয়াল যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে বাস্তব জীবনে নেমে আসবে?

জেনারেশন-জির আন্দোলন ১ জুলাই শুরু হয়েছিল, যা শুরুতে 'বৈষম্যের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন' নামে পরিচিত ছিল। এর আগে ৫ জুন সুপ্রিম কোর্ট ২০১৮ সালে কোটা বাতিলের সরকারি আদেশকে অবৈধ ঘোষণা করে। এই আন্দোলনে শিক্ষার্থীরা বিচার বিভাগ, প্রশাসন এবং আইনসভা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি শক্তিশালী প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হয়, যারা পুরোপুরি স্বৈরাচারের অনুগত ছিল। রাজনৈতিক আন্দোলনের কোনো অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও, জেনারেশন-জির এই যোদ্ধারা ছিলেন স্মার্ট এবং প্রযুক্তিগতভাবে দক্ষ; যারা দীর্ঘদিন ধরে ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নেটওয়ার্কিংয়ের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। তাদের আরেকটি সুবিধা ছিল যে, তারা প্রশাসনের নিরাপত্তা ব্যবস্থার নজরদারির বাইরে ছিল। কারণ তাদের কোনো উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক পরিচয় ছিল না। ফলে তাদের জন্য ভার্চুয়াল মাধ্যমে নির্বিঘ্নে যোগাযোগ করা সহজ ছিল।

বাংলাদেশে ১ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত ৩৬ দিনের এই ছাত্র আন্দোলন, যা জেন-জির নেতৃত্বাধীন ছিল। একটি উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে রয়ে যাবে–কিভাবে সাহসী এক প্রজন্মের ছাত্ররা একটি তৃতীয় বিশ্বের দেশে জনসাধারণের বিপ্লব আনতে সক্ষম হতে পারে! এই ৩৬ দিনের আন্দোলন প্রমাণ করেছে যে, একটি সাহসী প্রজন্ম কীভাবে জনগণের বিপ্লব ঘটিয়ে একটি শক্তিশালী স্বৈরাচারী শাসনের পতন ঘটাতে পারে। জেনারেশন-জির এই বিপ্লব বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

জেন-জি প্রজন্মের দৃঢ় মতামত রয়েছে এবং তারা তাদের কথা বলতে ভয় পায় না। জেন-জি তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা, সামাজিক ও রাজনৈতিক ইস্যুতে ত্যাগ ও আত্ম বলিদানের জন্য পরিচিত। শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ প্রমাণ করে যে, তরুণ বাংলাদেশিরা ৫০ বছর আগের ঘটনার উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিভাগের বাইরে যেতে প্রস্তুত। এটি একটি সত্যিকারের ট্র্যাজেডি যখন একটি অস্ত্র, বিরোধীদের নির্মূল করার জন্য কঠোরভাবে তাক করা হয় এবং এটি বুমেরাং হয়ে ফিরে আসে। গত পাঁচ দশকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে 'রাজাকার' এবং 'মুক্তিযোদ্ধা' শব্দগুলোর অতি ব্যবহার একটি ট্র্যাজেডির প্রতিফলন করে। সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলনে শত শত মানুষ শহীদ হয়েছেন এবং বহুসংখ্যক আহত, গ্রেফতার বা নিখোঁজ হয়েছেন।

দেশের বন্যা পরিস্থিতিতেও এই জেন-জি রাই তাদের সর্বোচ্চটা দিয়ে দেশের মানুষের জন্য এগিয়ে এসেছে। বন্যার্তদের জন্য ত্রাণ সংগ্রহে জেন-জি সামাজিক মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে বন্যার প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করেছে। অনেক অনেক তরুণ বিভিন্ন এনজিও এবং স্থানীয় সংস্থার সাথে মিলিত হয়ে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ, চিকিৎসা সহায়তা প্রদান এবং বন্যা-বিধ্বস্ত সম্প্রদায়কে সাহায্য করেছে। ভবিষ্যতেও এই ছাত্রসমাজ মানুষের পাশে দাঁড়াতে কখনো দ্বিতীয়বার চিন্তা করবে না।

বাংলাদেশে জেনারেশন-জি নানা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। শিক্ষার মান উন্নয়ন, বেকারত্ব, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সামাজিক বৈষম্য তাদের অগ্রগতির পথে বড় বাধা হিসেবে দাঁড়িয়েছে। তরুণ প্রজন্মের অনেকেই বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য যেতে চায়, কারণ তারা দেশে পর্যাপ্ত সুযোগ দেখতে পায় না। ফলে মেধা পাচারও একটি বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে।

বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নে জেনারেশন জি-র ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাদের উদ্ভাবনী চিন্তা, প্রযুক্তিগত জ্ঞান এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। এজন্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর উচিত তাদের জন্য আরও সুযোগ সৃষ্টি করা এবং তাদের কণ্ঠকে গুরুত্ব দেওয়া, যাতে তারা নিজেদের সম্পূর্ণভাবে বিকশিত করতে পারে এবং দেশের উন্নয়নে আরও সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারে।

একান্ত অনুরোধে

আল জামাল মোস্তফা সিন্দাইনী
সহযোগী অধ্যাপক
ডিপার্টমেন্ট অব সোশিওলজি

একান্ত অনুরোধে শূন্যের ভেলায় চড়তে পারিনি আমি
সঞ্জীবিত স্নিগ্ধের খোঁজে হেঁটেছি দুর্গম পথ
খোলা দূর্বাভূমি দেখে দেখে পুলকে মেতেছি শুধু
সবুজাভ ক্ষেতের আল ধরে হেঁটেছি শুধু পুলকে
ভালোবাসাহীন রাত পোহাতে চায়না ঘুম কেড়ে নিয়ে
জীবনের দীর্ঘশ্বাসে রৌদ্র স্নান হয়নি অকুল দরিয়া যেয়ে।

অন্ধকারের হতাশায় অসীম চিন্তায় হারাতে পারিনি একা
নিস্তরঙ্গ নদীর কান্না শুনেছি গভীর রাতের শেষে
বৃষ্টি স্নাত রাতে ব্যাকুলতা বেড়েছে ঘুম নামেনি চোখে
অকালের শেষে ফুল ফুটেছে নানান রকম কাজে
অনাগত স্বপ্ন স্বপ্নেই থাকলো বিবর্ণ পাথরের নিচে
নানান ভেদে অনুরক্ত হতে চেয়েছিলাম ভালোবাসা নিয়ে।

বিচ্ছিন্ন সড়কে চলতে গিয়ে বেসামাল হয়ে পড়েছি
গর্বিত ভালোবাসার খোঁজ নিতে হারিয়েছি অনেক দিন
অচেনা সময়ে কেটেছে দিন হিসাব রাখিনি তার
বিষণ্ন মনে চলতে চলতে ক্লান্তি এসেছে মনে
নক্ষত্রের আলোতে আকাশের গাঙে ভাসাই শুধু তরী
সৌন্দর্যময় উপত্যকায় কেউ নেই ভালোবাসার গল্প শুনতে।

শীতের কুয়াশায় কেঁপে উঠি ভালোবাসার ছোঁয়ার জন্য
নিসর্গের সংলাপ গুমরে ফেরে রাতের খোলা মাঠে
অন্তরের ভালোবাসা অন্তরে থেকে হাসায় আর কাঁদায়
বিনীত চাহনির ভাষা বুঝলেও বলতে পারিনি কখনো
বিষণ্ন চিৎকারে সব অন্ধকার যে দিকে তাকাই আমি
ভালোবাসার স্বপ্ন ফিকে হয় জীবনের বন্দরে বন্দরে।

কথা

মেজর মোঃ মাহবুব আলম
কর্ড টু রেজিস্ট্রার
অফিস অব দ্য রেজিস্ট্রার, বিইউপি

কথারা ছড়ায় উলুবনে মুক্তায়,
কথারা হারায় পুরনো ছেঁড়া খাতায়,
কথার মলাটে ঢেকে যায় রূপকথা,
কথাতেই বাড়ে ভালোবাসা, ব্যাকুলতা।

কথাতেই সনির্বন্ধ অনুরোধ,
কথাতেই মিল, কথাতেই বিরোধ।
কথার অভাবে অভিমান, অনুরাগে
কথার ডানায় হৃদয়ে স্মৃতিরা জাগে।

কথার প্রেমেই হিম কিশোরীর মন!
কথা দিয়ে দূরে চলে গেলে প্রিয়জন,
বিরহ পোড়ায় মনে পড়ে তার কথা,
দুঃখ বিলাপে ঝরে অশ্রু-বারতা।

কথার মিছিলে কথাতেই শ্লোগান,
দাবি আদায়ের চিরায়ত অভিযান,
কথাহীনতার মৌন মিছিল চলে
মনের গহীনে কথার আগুন জ্বেলে।

কথাতে স্বস্তি কথাতেই আশ্বাস,
বয় চারিদিকে শান্তির সুবাতাস,
কথাতে শক্তি ফিরে পায় ভাঙা মন,
কথারাই যেন ক্ষতের মুখে মলম।

কথারা পোড়ায়, কথারা ভাসায় সুখে,
'কথার-কথা'রা চলে লোক মুখে মুখে,
কথারা পুড়লে 'মুখ পোড়া' বলে লোকে,
কথারাই হয় অশ্রু-বিলাপ, শোকে।

কথারা ফুরায় জীবনের গাঢ় ভাঁজে,
জীবন হারায় প্রকৃতির কারুকাজে,
সবশেষে তবু কথারাই থেকে যায়,
কখনো আঘাতে, কখনো কোমলতায়।

বৃষ্টি সুন্দর!

মোঃ তারিফুজ্জামান
সেকশন অফিসার
ডিপার্টমেন্ট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং

বৃষ্টির যদি নাম না থাকতো,
নাম দিতাম স্নিগ্ধি।
স্নিগ্ধি কেন হবে না?
যার প্রতিটি কণায় স্নিগ্ধতা।

বৃষ্টির যদি নাম না থাকতো,
নাম দিতাম ব্যাকুলতা।
কেনইবা হবে না, ব্যাকুলতা?
বৃষ্টি যে মানব মনকে ব্যাকুল করে তোলে।

বৃষ্টির যদি নাম না থাকতো,
নাম দিতাম তরুণিমা।
তরুণিমাতো সেই তারুণ্য,
যা জীর্ণ প্রকৃতিকে জীবন্ত করে তোলে।

বৃষ্টির যদি নাম না থাকতো,
নাম দিতাম সরলতা।
কেনইবা হবে না, সরলতা?
বৃষ্টিতো সরল মনেই আসে,
কার ভালো, কার মন্দ,
সে কিচ্ছু বোঝে না।

যেমন শুকনো মরু পরমানন্দে
বৃষ্টিকে আপন করে টেনে নেয়,
মাঠের ফসল ও কৃষকের হৃদয়,
একইসাথে সজীব হয়ে যায়।

তেমনি,
প্রকৃতির রূপে কিশোর-যুবক-বৃদ্ধ মন,
মুগ্ধতায় একত্ব হয়ে যায়।
আবার সেই বৃষ্টিতেই,
আলোকিত শহর হয় অন্ধকার,
ডুবে যাই অলি-গলি,
সমতল হয় প্লাবিত, পাহাড়ে ঢল নামে,
প্রিয় মানুষ মাটিচাপা পড়ে পাহাড়তলীতে।

তাই যে নামেই ডাকি,
বৃষ্টি সুন্দর!
বৃষ্টি-ভয়ংকর সুন্দর!

শ্রেষ্ঠ তাঁরা

হোজাইফা রহমান খান
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব কম্পিউটার সাইন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং

এমনও কি দিন আসে?
ছেলের সামনে বাবা নিজে আজ দাঁড়িয়ে চাকরের পাশে।
ছেলের গলায় হুংকার শুনে বাবা বন্ধ করেছে মুখ,
ছেলে কয়, 'আরতো পারি না, কিসের এতো অসুখ?'
মনে পড়ে বাবা অসুখের সময় কত যত্ন করেছিলো ছেলের,
সেই ছেলে হায়, আজ একথা শোনায়, দোষ কি তার কপালের?
বাবা বলেন, 'কেন গো বাবা? টাকার অভাব তো নেই তোমার'
ছেলে কয়, 'তাই বলে কি প্রতিবারই তোমায় টাকা দেওয়া দরকার।'
বাবা ফিরে যায়, যেতে যেতে তার ছেলের দিকে তাকায়,
ছেলে বাবাকে গাল দেয় আর নিজের চোখ পাকায়।
ক্লান্ত শরীর টেনে টেনে বাবা এসেছে বাড়ির সামনে,
স্ত্রীর কাছে তার ছেলের কথা বলবে আজ সে কেমনে?
ভেতর হতে অসুস্থ মা দ্রুত পায়ে এলো বেরিয়ে
এসে দেখে তার স্বামী তো এক অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে।
মা জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় আমার ছেলে? কেন আসেনি সে?'
বাবা বলেন, 'কিভাবে সে আসবে, তার অনেক কাজ পড়ে আছে যে'
এমনই করে কত মিথ্যে কথা বলে আসছে বাবা,
সত্য বললে মৃত্যুর বাঘ স্ত্রীকে দিবে মরণ থাবা।
ছেলেতো দেয়নি টাকা, তাইতো ঔষধ হয়নি কেনা,
যেদিকে যায় লোকে বলে, 'শোধ কি করবে না তোমার দেনা?'
এমনইভাবে দিন কেটে যায়, আসে রাতের আভা।
সময় হয়েছে, মৃত্যুর দূত ডেকেছে মৃত্যু সভা।

মৃত্যু শয্যায় শুয়ে শুয়ে মা ছেলের জন্য দোয়া করে,
এমন সময় সেই ছেলে হায়, টাকার হিসাব করে।
ওপার হতে নৌকা এসে এপারের ঘাটে ভিড়ায়,
ছেলেকে নিয়ে ভাবতে ভাবতে মার বুক ফেটে যায়।
যাওয়ার সময় মা বলে, 'ছেলের খেয়াল রেখো।'
সন্তানের প্রতি ভালোবাসা মায়ের এমনই তো হয় দেখো।
পূর্ব কোণে সূর্য উঠেছে, আকাশ হয়েছে লাল,
উঠেনি তো মা, উঠবে না কোনো দিন, উঠবে না কোনো কাল।
মায়ের পাশে একা বসে বাবা আঁখি জল ফেলে যায়,

যদি হঠাৎ করে ভালোবাসা তার একবার ফিরে চায়।
সাড়ে তিন হাত মাটির নিচে মাকে শুইয়ে দিলো বাবা,
পশ্চিম দিকে তাকিয়ে মা, যেদিকে রয়েছে কাবা।
নিজ হাতে বাবা কোদাল দিয়ে মাটি দিচ্ছে মাকে,
প্রতি কণা মাটি দিতে বুক থর থর করে কাঁপে।
সবশেষে বৃষ্টি এলো, ভিজিয়ে দিলো কবর,
কোথায় ছেলে? আসেনি তো সে, সে কি পায়নি খবর?
কবরের পাশে একা বসে বাবা, শরীর ভেজা তার
এখানেই বসে থাকবে বাবা, যাবে না কোথাও আর।
মাকে ছাড়া এ পৃথিবীর বয়স হলো আজ একদিন,
খাবার টেবিলের সেই চেয়ার ফাঁকা, যেখানে বসতো মা প্রতিদিন।
মায়ের কবর দেখতে ছেলে একবারও না আসে,
কবর হতে ডাকছে মা, শব্দ শোনা যায় চারপাশে।
কতদিন হয়ে গেলো ছেলের নেই যে কোনো দেখা,
ছেলের বাসায় গিয়ে দেখে বাবা, বাড়ি বিক্রির খবর লেখা।
এমন সময় কোথায় যাবে ছেলে, তার সবকিছু ফেলে?
বাবা ভাবে, 'হারিয়েছি সব, কী আছে বাকি? আমিও যাবো চলে'
বাবা শুনেছে, তার ছেলের নাকি বাকি ছিলো অনেক ঋণ,
এজন্য ছেলে পালিয়েছে প্রাণে, খোঁজ নেই বারো দিন।

এখন সবই শূন্য লাগে রিক্ত পাত্রের মতো,
দিন পেরিয়ে মাস, মাস পেরিয়ে বছর, এভাবে আর যাবে কত?
চোখে নেই ঘুম, ঠোঁটে নেই হাসি, মনে শান্তি নেই এক বিন্দু,
হঠাৎ একদিন বাবার সাথে দেখা তার ছেলের এক বন্ধুর।
জিজ্ঞেস করে বাবা, 'কোথায় আমার ছেলে? কী হয়েছে তার?'
চমকে গিয়ে বন্ধু বলে, 'একি অবস্থা হয়েছে আপনার!'
'ছেলে আমার কোথায় আছে? কেমন আছে বলো আগে?'
'সে তো আছে কারাগারে, বন্দি চার দেয়ালের মাঝে।'
'আচ্ছা বাবা আসি এখন, কথা আছে ছেলের সাথে।'
বলেই বাবা হেঁটে চললো কারাগারের ঢালাই পথে।
কারাগারের সামনে বাবা, কানে হাহাকারের শব্দ,
তবুও তো লাগে বাবার কাছে সবই নিস্তব্ধ।
ভেতরে গিয়ে প্রতিকক্ষে বাবা খুঁজছে তার ছেলেকে,
প্রতিটি কক্ষই লাগে অন্ধকার এই উজ্জ্বল দিবালোকে।
হঠাৎ করে পেছন থেকে 'বাবা' ডাক ভেসে আসে,
পেছনে ফিরে দেখে তার ছেলে মেঝেতে শুয়ে আছে।
দেহখান যেন শুধু কঙ্কাল তাতে নেই তো কিছু আর,
সামনে গিয়ে ছেলের হাত ধরে বাবা করে উঠল চিৎকার।
ছেলে বলে, 'দেখতে আসেনি কেউই, তুমি এসেছো বাবা।'
বাবা বলেন, 'এমন সময় পাবে না কাউকে, কেবল মা-বাবাকেই কাছে পাবা।'
'কেন বাবা এমনটি হলো?', জিজ্ঞেস করে ছেলে,
বাবা বলেন, 'এমন তো হতো না, যদি আমাদের দিতে না তুমি ফেলে।'

শিক্ষা

মোঃ মশিউর রহমান অন্তর
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন

পৃথিবী সৃষ্টি থেকেই বেড়েই চলেছে শিক্ষার প্রসারতা,
সৃষ্টি হয়েছে কত চার্লস উড এর মত শিক্ষা প্রস্তাবনা।
বহু শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে অমর হয়েছে শ্রীকান্ত জিচকার,
নিজের বই দিয়ে গড়া লাইব্রেরিকে দিয়েছে বিশাল আকার।

গড়ে উঠেছিল কত স্যাডলার, হান্টার কমিশন-
বলতে হয়, শিক্ষায় ছিল এগুলোর প্রধান ভিশন।
শুরু হয়ে গেল শিক্ষা নিয়ে জীবন যাপন,
ফ্রাঙ্ক লিউব্যাক, চার্লস উড ও স্যার সৈয়দ আহমেদ সহ
অনেকের কাছে শিক্ষায় হয়ে উঠলো বেশ আপন।
গড়ে উঠলো কত শিক্ষা গবেষণা কেন্দ্র, অফিস, আদালত ও উঁচু ভবন,
দেখে যেন মনে হলো, চারিদিকে শুরু হয়েছে শিক্ষার প্লাবন।

নিচ্ছে তারা পিএইচডি'র মত উচ্চ ডিগ্রিসহ আরও কত কি,
আসলে তারা কি সবাই জানে, শিক্ষা কাহাকে বলে ও শিক্ষার উদ্দেশ্য কি?
অনেকেই উচ্চ ডিগ্রি নিচ্ছে মনুষ্যত্ব ছাড়া,
দাবি করছে সর্বোচ্চ শিক্ষিত জাতি তারা!

যদি তাদের প্রশ্ন ছুড়ে দেওয়া হয়, শিক্ষা কি?
জবাবে তারা উত্তর দেয়, জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জন ছাড়া আর বা কি।
এমন যদি হয় তাদের শিক্ষা, ভাবো একবার তাদের দীক্ষা!

কি লাভ ? যদি উচ্চ শিক্ষাও ব্যর্থ হয় মূল্যবোধ জাগাতে,
কিভাবে তুমি পারবে মূল লক্ষ্যের দিকে আগাতে?
ভুল করে মনুষ্যত্ব ছাড়া উচ্চ ডিগ্রি নিচ্ছে যারা,
কভুও সু-শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারবে না তারা।

যে পারবে না, ব্যক্তির মূল্যবোধ জাগাতে ও গুণাবলির বিকাশ ঘটাতে,
কু-শিক্ষার গোঁড়ামি থেকে পারবে না তাকে কেউ বাঁচাতে।

জলপোকা

মোঃ ফুয়াদ হাসান
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব ল

নবাগত পথে গোধূলির রথে ধূলো লিখে কথকতা,,
আগতের ঘাতে শত ক্ষত হতে মিলায় লৌকিকতা।
করঞ্জা হত, মৌরী বিক্ষত, প্রাক্তন কৃষ্ণকথা;
ঈশান কোণে রিক্ত নয়নে নত যে বাস্তবতা।

ঝরে পড়া প্রাণে, ঘ্রাণ হারা ভানে বকুলের শত ব্যাথা;
কোলে ঢলে তাই কলমি জানাই দু'কূলের যত কথা।

অরুণের তরে করুণার সুরে গান যে হয়েছে গাঁথা,
বেবাগী হয়ে চর কাঁদে জেগে সরিয়ে জলের কাঁথা।

জলপোকা আজ অভিমানী মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে সিক্ত,
কামিনী যে তাকে বিদ্ধ করে হৃদয় করেছে রিক্ত।
শূক কীট আজ শোনেনি বারণ, স্রত যে হয়েছে ক্ষিপ্ত;
কচুরি পানা মানেনি মানা, হৃদয় করেছে তিক্ত!

শরতের প্রেমে চাইনি গো থেমে ছুটে চলা মেঘ ভেলা,
প্রাতের প্রপাতে ব্যস্ত হয়েছে মলিন গোধূলি বেলা,
দূর্বার তরে ফড়িং যে তার তুচ্ছ করেছে খেলা,
ভ্রমরের তরে প্রজাপতি তারে করেছে যে অবহেলা।

জলপোকা আজ বুকে আঁকে ভাঁজ অভিমানী নানা ছলে,
হৃদয় ভেঙে সে রওয়ানা দিয়েছে কভু না ফেরার জলে।
চাইবে না ফিরে, ফিরবে না আর কোনো রাতে মোহ ভুলে;
ভিজবে না জলে, তলাবে অতলে, ফিরবে না তবু কূলে।

ক্ষতে নত হয়ে এগোচ্ছে কীট, যন্ত্রণা থোকা থোকা;
যূথি বাঁধে গীত, তবুও যে কীট ভুলেনি বিগত ধোঁকা।

প্রকৃতি কাঁদে, প্রতীতির ফাঁদে বসু যে হারাবে খোকা;
ছলছল করে নির্মল তালে,
তবু ফিরবে না জলপোকা!

মানবজাতির জাগরণ

সামিয়া জাহান
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি

জেগে থাকা মানুষকে কেমন করে জাগায়?
সব দেখে যে অন্ধ সাজে কিভাবে তাদের দেখায়?

কান্নারত বাচ্চা শুধু দেখতে মাকে চায়,
মা যে তার শহীদ হয়েছে বুঝানো বড় দায়!
বাবার নামের পোস্টারে আলিঙ্গনে শিশু,
রক্তে-ম্যাংসে মানুষটা যে আসবে না আর কভু।

বিশ্ব এসবই দেখে তবুও নিশ্চুপ
অন্য শহর! মরছে মরুক; যায় আসে কি খুব!

দিন পেরিয়ে মাস গড়ালেও লাশের মিছিল কমেনি,
সন্তান সব কবর দিয়ে পিতার অশ্রু থামেনি।
চোখের সামনে জিপ
গেলো তো প্রসূতি নারীর উপরে,
বিবেক কারও নড়লো না রে; চুপ করে তাও সকলে।

জেগে থাকা মানুষকে ভাই কেমন করে জাগায়?
সব দেখে যে অন্ধ সাজে কিভাবে তাদের বোঝায়?

লাশের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে উঠছে কত লোকে,
বিবেক যে আজ খেয়েছে সব অর্থ লোভী পোকে।
রাত্রি হলে খবর দেখে নিদ্রা যাওয়া সমাজ,
উদর-হস্তে রক্ত মেখে শুরু করে প্রভাত।

দেখেও যারা দেখে না কিছু, বুঝেও যারা বোঝেনা,
সকাল হলে চোখ খুলেও কিছুই তারা দেখেনা।

কাঁপেনি হাত ছুঁড়তে মিসাইল, ছুঁড়তে বারুদ-বোমা?
কাঁপেনি হাত বিষিয়ে দিতে দালান-অট্টালিকা?
হয়নি কী দরদ কভু ছোট্টো শিশুর তরেও?
জানাজা যাদের হয়নি নসীব শহীদ হয়ে মরেও।
নিজের দেশে নিপীড়িত যাযাবর আজ তারা,
অনাহারে, নির্বিচারে বড্ড দিশেহারা।

জেগে থাকা মানুষকে ভাই কেমন করে জাগায়?
সব দেখে যে অন্ধ সাজে কিভাবে তাদের দেখায়?

রাজপথে যেদিন রক্ত না ভাই বইবে খুশির জোয়ার,
মুক্ত যেদিন হবে তারা, বিজয় হবে তাদের,
যুদ্ধ থেমে শহীদ ভেজা মাটি আপন হবে যখন,
বলবো তখন মানবজাতির হয়েছে জাগরণ।

স্মৃতির পাতা

তামজিদ আহমেদ ইমন
শিক্ষার্থী
ডিপার্টমেন্ট অব কম্পিউটার সাইন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং

স্মৃতির পাতায় থেকে যাক
হারিয়ে যাওয়া সেই সোনালী দিনগুলো,
রুপালি চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত
সেই মায়াবী রাতগুলো।

স্মৃতির পাতায় থেকে যাক
শৈশবের সেই সোনালী দিনগুলো,
ভেলায় চেপে হারিয়ে যাওয়া
সেই মধুর স্মৃতিগুলো।

স্মৃতির পাতায় থেকে যাক
গ্রামের সবুজ মাঠে অবুঝ লুটোপুটি
ধূলোমাখা গায়ে মায়ের বকুনি
ডুব সাঁতারে হারিয়ে পাওয়া মধুর খুনসুটি।

স্মৃতির পাতায় থেকে যাক
গ্রামের আঁকাবাকা সেই মেঠোপথগুলো,
রাতের বেলায় ঝিঁঝিঁর ডাক
আর মায়াভরা সেই রাতগুলো।

স্মৃতির পাতায় থেকে যাক
অশ্রু নদীতে রিক্ত হওয়া গল্পগুলো,
কালের বিবর্তনে হারিয়ে যাওয়া
অবহেলার কৃষ্ণাভ আবরণের ক্ষণগুলো।

স্মৃতির পাতায় থেকে যাক
অতীত নামের সেই সুখস্মৃতি
মায়ার বাধনে বেঁধে রাখা সেই
ভালো লাগা অনুভূতি।

মহীয়সী নারী

তামান্না তাসনিম
শিক্ষার্থী
মাস্টার্স অব ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি

মহীয়সী শত নারীদের আজ গাইবো জয়গান,
নারীরা আজ পাচ্ছে কতটা মর্যাদা সম্মান !
ধৈর্য, বুদ্ধি, সাহসিকতায় অনন্যা এই নারী
কয়জন তাদের পরিপূর্ণ সম্মান দিতে পারি?
সদর অন্দরের সর্ব কাজে যার সফল পদচারণা
সেই তার খোঁজ কয়জনে রাখে আছে কি তোমার জানা?
পান থেকে চুন খসলে তোমার তিক্ত আচরণ
রূঢ় ব্যবহার হয় না যেন তার হীনমন্যতার কারণ।
তার ব্যর্থতা, অসুস্থতা বা মন খারাপের দিনে
ভালোবাসার হাত বাড়িয়ে পাশে থাকবে প্রতিক্ষণে।
পুরুষতান্ত্রিক এ সমাজ শুধু পুরুষকেই বড় করে
ভেবেছো কি সেই পুরুষকেই নারী গর্ভে ধারণ করে!
নারীর কারণে অলংকৃত প্রতিটি মলিন ঘর,
দশভুজা নারী দৃষ্টি যে তার সর্বদিকে প্রখর।
সবার সুখের জন্য যে দেয় নিজের সুখ বিসর্জন,
না ভুলি যেন করতে তার শখ আহ্লাদ পূরণ।
জয় হোক সে নারীদের, খুলুক সাম্যবাদের দ্বার
আনন্দময় হোক সকল সুন্দর সুখী পরিবার।

CADENCE

Annual Magazine 2024

BANGLADESH UNIVERSITY OF PROFESSIONALS

Mirpur Cantonment, Dhaka-1216

www.bup.edu.bd